বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগ কর্ত্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত
(কলিকাতা গেজেট, ২১শে এপ্রিল, ১৯৪৩)

পুনর্মুদ্রণ
মহালয়া—১৩৫১

দেব-সাহিত্য-কুটীর ● ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

দেব-সাহিত্য-কুটীর
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক
প্রকাশিত

দাম—এক টাকা চার আনা

দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে
এস. সি. মজুমদার কর্তৃক
মুদ্রিত

উপহার

'খবরদার ! এই ভাত তুই নিয়ে যেতে পারবি না। ··তোকে খেতে হবে।'

—৭৩ পৃষ্ঠা

দুই ভাই

এক

উপরের ঘর থেকে সবই বিনয় দেখছিলো। দেখছিলো ফটকের বাইরে ছই-ঢাকা একখানা গরুর গাড়ি এসে দাঁড়ালো। গরু ছেড়ে দিয়ে গাড়িটা নামিয়ে রাখতেই তার থেকে নেমে এলো একজন প্রৌঢ় স্ত্রীলোক, দেখলেই মনে হয় যেন অত্যন্ত দুঃস্থ। আভাসে বোঝা যাচ্ছিলো মুখ করুণ, বেদনার্ত ; কেমন উৎসুক অথচ ভীত চাহনি!

গাড়ি থেকে নেমে স্ত্রীলোকটি খোলা ফটক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো। সামনেই কাছারি, নায়েবের দপ্তর। ফরাসে বসে জমানবীশ ও তার মুহুরিরা কাজ করছে, নায়েববাবু তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে গড়গড়া টানছেন, উপর থেকে চোখে ঠিক না পড়লেও দৃশ্যটা কল্পনা করে নেয়া বিনয়ের পক্ষে কঠিন নয়।

উঠোন পেরিয়ে স্ত্রীলোকটি কাছারি-বাড়ীর সিঁড়ির প্রথম ধাপের উপর পা রেখেছে, ভিতর থেকে নায়েববাবু হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন : 'আবার এসেছেন আপনি ?' বাবু আপনাকে আসতে বারণ করে দিয়েছেন আপনার তা মনে নেই ?'

ক্ষীণ ম্লানকণ্ঠে স্ত্রীলোকটি কী বলল, তা কিছুই বোঝা গেলনা।

কিন্তু নায়েবের কণ্ঠস্বরে একবিন্দু কোমলতা নেই। তাঁর গলা যেমন স্পষ্ট তেমনি তেজী। বললেন, “না, হবে না, কোনো সময় হবে না।’

প্রত্যুত্তরে স্ত্রীলোকটি আবার যেন কী বলল নিম্ন, আর্দ্র স্বরে।

নায়েবের গলায় আবার বাজ ডেকে উঠলো : ‘না, আপনার কোনো কথা শোনা হবে না। ভালোয় ভালোয় যদি না যান—’ কথাটা শেষ না করেই যেন ইঙ্গিতটা তিনি আতঙ্কময় করে তুললেন।

তার জানালা থেকে বিনয় দেখলো স্ত্রীলোকটি তার গাড়ির দিকে ফিরে যাচ্ছে। যে আঁচল গায়ের উপর দিয়ে ঘন করে টানা ছিল, তারই প্রান্ত দিয়ে চোখের জল মুছছে বোধহয়।

দ্রুত পায়ে বিনয় নীচে নেমে এলো। একেবারে কাছারিঘরে। যা সে ভেবেছিলো, নধর দেহখানাকে আধখানা ভেঙে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে নায়েববাবু কোমল আলস্যে গড়গড়া টানছেন।

স্পষ্ট, একটু বা কঠিন গলায় বিনয় বললে, ‘ঐ ভদ্রমহিলার সঙ্গে এমন রূঢ় ব্যবহার করবার অর্থ ?’

তার ভঙ্গিটা ঠিক শাসনকর্তার ভঙ্গি, কিন্তু ব্রজলাল ভ্রূক্ষেপও করলেন না। মোটা একটা হিসাবের খাতা টেনে নিয়ে অনাবশ্যক আগ্রহে তাতে মনঃসংযোগ করলেন।

‘কে ঐ ভদ্রমহিলা ?’ বিনয় কর্কশ কণ্ঠে জিগগেস করলে।

খাতা থেকে চোখ না তুলেই ব্রজলাল বললেন, 'এখানকার একজন ভিক্ষুক।'

'এখানকার ভিক্ষুক! কই, কোনোদিন দেখিনি তো আগে!' বিনয় একটু অবাক হলো।

'ঠিক এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা নয়', ব্রজলাল তেমনি নির্লিপ্ত, উদাসীন ভাবে বললেন, 'মাঝে-মাঝে আসে, আবার চলে যায়। অনেকদিন পরে আজ আবার এসেছিলো।'

'কী চায় সে ভিক্ষে?'

'অভাবে পড়লে লোকে যা চায়।' ব্রজলালের স্বরে তেমনি উপেক্ষা।

'চাল-ডাল? পয়সা-কড়ি?'

'তাই হবে হয়তো।'

'হবে হয়তো মানে?' বিনয় ঝাঁজিয়ে উঠলো: 'তাকে জিগগেস করেন নি সে কী চায়? আর, সাধারণ চাল-ডাল বা পয়সা-কড়ির যে ভিক্ষুক, সে কখনো গাড়িতে করে ভিক্ষে করতে আসে?'

ব্রজলাল চুপ করে রইলেন।

'আর সাধারণ যে ভিক্ষুক তাকে 'আপনি' বলে সম্মান দেখাবার কিছু প্রয়োজন আছে বলে তো মনে হয় না।'

'তা..ঐ, গাড়ি চড়ে এসেছে বলে।' ব্রজলালের মুখে প্রচ্ছন্ন রেখায় ক্ষীণ হাসি ফুটলো।

'কিন্তু তার আবেদন না শুনেই তাকে তাড়িয়ে দেবার অর্থ কী?'

'কারু আবেদন শোনবার আমার প্রবৃত্তি নেই। আমার অন্য কাজ আছে।' ব্রজলালের মুখ মেঘলিপ্ত আকাশের মতো গম্ভীর।

'আপনার কাজ কী আছে না আছে তা আমি জানি। কিন্তু দুঃস্থ একজন ভদ্রমহিলা যদি কোনো প্রার্থনা নিয়ে এসে থাকে, তার বক্তব্যটা সম্পূর্ণ না শুনে তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়ার মধ্যে কোনোই কৃতিত্ব নেই।'

'এই বললে, তাকে 'আপনি' বলে সম্মান দেখালুম আর এই বলছ চলে যেতে বলায় তাকে অপমান করা হলো—ভাষার কৃতিত্ব আমার নেই বটে!' ব্রজলাল তাঁর স্বরটাকে একটু বাঁকা করলেন। তারপর সোজাসুজি, একটু বা দৃঢ় গলায় বললেন, 'ভিক্ষুক এসেছিলো আমার কাছে, তাকে কী দিতে হবে বা না-হবে, কী বলতে হবে বা না-হবে তা আমি জানি। তোমার কাছে যখন সে যাবে, তখন তুমি তাকে দান-খয়রাৎ করো বা পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে পূজো করো আমি কিছুই বলতে আসবো না।'

'আচ্ছা, দেখা যাবে।' খুব একটা রাগের ভঙ্গি করে বিনয় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যেন এখুনি সে এর একটা কিছু প্রতিবিধান করবে এমনি ভাব!

গেল সে তার বাবার কাছে। জানতো, নায়েব ব্রজলাল বাবার ডান-হাত, কোনো সুরাহাই হয়নি এ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে নালিশ করে। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা স্বতন্ত্র। আজকের তার নালিশটা জমিদার-সংক্রান্ত কোনো অত্যাচারের বিরুদ্ধে নয়, নিতান্তই ব্যক্তিগত। সুফল কিছু হলেও হতে পারে হয়তো।

বিজয়নারায়ণ তখন রোদে বসে তেল মাখাচ্ছিলেন, ব্যস্ত-ভঙ্গিতে বিনয় কাছে এসে দাঁড়ালো। কোনো ভূমিকা না করেই বললে, 'ব্রজ-নায়েব দিন-কে-দিন ভীষণ বেয়াদব হয়ে উঠছে বাবা। ওকে এক্ষুনি বরখাস্ত করে দেয়া উচিত।'

'কেন, কারু পাকা ধানে মই দিয়েছে বুঝি?' বিজয়বাবু কুটিল দৃষ্টিতে বললেন, 'কারু জমির দখল নিয়েছে বুঝি জোর করে? ভিটে-মাটি থেকে কাউকে দিয়েছে বুঝি উৎখাত করে?'

'তেমন কিছু করলে আপনি তো নালিশ কানেই তুলতেন না। আপনার মতে সেগুলো তো অত্যন্ত গুণের কাজ।'

'নিশ্চয়ই।' বিজয়বাবু সপ্রশংস ভাবে বললেন, 'জমিদারিটা যদি রাখতে হয় বাঁচিয়ে। জানো তো, আইন নিরপেক্ষ, কর্তব্য নিষ্ঠুর। তাই, আইন যে অধিকার দিয়েছে তা খাটাতে গিয়ে নায়েবমশাই যদি কখনো কোথাও নিষ্ঠুর হন, তবে তাঁকে তুমি মোটেই দোষ দিতে পারো না। বরং তাঁকে তোমার কর্তব্য-পরায়ণ বলে প্রশংসা করা উচিত। প্রশংসা করা উচিত কুশলী বলে, বিচক্ষণ বলে। এমন লোককে বরখাস্ত করাও যা, জমিদারিটি গোল্লায় দেয়াও তাই।'

'কিন্তু একজন দরিদ্র ভদ্রমহিলাকে অপমান করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়াও কি তার কর্তব্যের মধ্যে নাকি?'

'তাড়িয়ে দিয়েছে? কাকে তাড়িয়ে দিয়েছে?' বিজয়বাবু চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

যতটুকু জানতো, বিনয় খুলে বললে ঘটনাটা।

যে দুটো চাকর দলাই-মলাই করছিলো তাদের একটাকে বিজয়বাবু পাঠিয়ে দিলেন নায়েবমশাইকে ডেকে আনতে।

ব্রজলাল একপাশে এসে দাঁড়ালেন। ঋজু, সতেজ ভঙ্গি।

'কী হয়েছে বলুন তো? কাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন?' জিগ্‌গেস করলেন বিজয়বাবু।

'সেই পাগলীটা আজ এসেছিলো। তাকে।' ব্রজলাল প্রসন্নমুখে বললেন।

'কোন্ পাগলী?' বিজয়বাবুর মুখ সন্দেহে ঈষৎ ঘোরালো হয়ে উঠলো: 'সেই জগৎঠাকরুন?'

'হ্যাঁ,' ব্রজলাল বললে, 'সেই জগৎমোহিনী।'

'বেশ করেছেন সেই পাগলটাকে তাড়িয়ে দিয়ে। কোনোদিন ঢুকতে দেবেন না এ-মুখো। আমি ভাবলুম কে-না-কে না-জানি এসেছিলো!' নিশ্চিন্ত মনে বিজয়বাবু তাঁর তৈলাক্ত দেহটা আবার চাকর দুটোর হাতের নীচে সমর্পণ করলেন।

সন্দেহ ঘুচলো না বিনয়ের। তাই জিগ্‌গেস করলে, 'পাগল হলে গরুর গাড়িতে আসবে কেন?'

'পাগল হলেও ভোলেনি যে সে পর্দানশীন। আর এই গাঁয়ে হাওয়া-গাড়ি হাওয়ায় উড়ে বেড়ায় না।' বিজয়বাবু টিপ্পনি কাটলেন।

ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হতে পারতো, কিন্তু বিনয় তার জের টেনে নিয়ে চললো তার মার কাছে।

সুনয়নী তখন রান্নাঘরে রান্নার তদারক করছেন। বিনয়

সটান সেখানে এসে উপস্থিত। বললে, 'আচ্ছা মা, চার বছর আগে, যখন আমি স্কুলে পড়ি, ক্লাশ টেন্-এ, তখন আমার শক্ত টাইফয়েড হয়েছিলো, তোমার মনে আছে ?'

'মনে থাকবে না কেন ?'

'তোমরা সব আমার জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিলে—বিয়াল্লিশ দিনের দিন—'

'কেন, তার হয়েছে কী ?'

'বিয়াল্লিশ দিনের দিন—তোমার মনে আছে মা, রাত্রে আমার অবস্থা যখন খুব খারাপ, তোমরা সবাই কাঁদাকাটা করছ, সেই সময় এক পাগলী চুপি-চুপি দোতলায় আমার শোবার ঘরে ঢুকে পড়েছিলো, সবাইর অলক্ষ্যে বসেছিলো এসে আমার শিয়রে! বালিশের থেকে আমার মাথাটা তার কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে আমার গায়ে হাত বুলুতে-বুলুতে বলেছিলো: 'কেঁদো না তোমরা, ভয় নেই, আমি এসেছি। খোকাকে আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।' তোমার মনে আছে মা ?'

'তোর কী করে মনে আছে ?' সুনয়নী হাসলেন।

'আমি ভালো হয়ে ওঠবার পর তোমরা সবাই আমাকে বলেছিলে সেই ঘটনাটা। বলেছিলে, পাগলী সমস্ত রাত আমাকে তেমনি কোলে করে বসে রইলো, বিজবিজ করে সমস্ত রাত কী ভূতের মন্ত্র আওড়ালে, আর সেই রাতেই আমার অবস্থা ভালোর দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। আমি তখন আচ্ছন্নের মতো

ছিলুম বটে, কিন্তু পরে, ভালো হয়ে, আমাকে ঘিরে তার সেই স্নেহের ব্যাকুলতাটা সর্বক্ষণ আমি অনুভব করেছি।'

'কেন, সে-সব কথা এতদিন পরে কেন ?'

'সেই পাগলীই বোধহয় ফিরে এসেছে, মা।'

'কোন্ পাগলী ?' সুনয়নী যেন ভয় পেলেন : 'জগপাগলী ?'

বিনয় একমুহূর্ত অবাক হয়ে গেল। বললে, 'নায়েববাবুও এই নামই বলছিলো বটে। কিন্তু সে ফিরে এসেছে শুনে তোমার ভয় পাবার কারণ কী? যে আমার জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে, সে তো আমাদের ঘরে একজন বাঞ্ছনীয় অতিথি, মা!'

সুনয়নী আর কোনো কথার ধার ধারলেন না। গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে ডেকে উঠলেন : 'মাধব! মাধব!'

মাধব সুনয়নীর ছোট ছেলে, পাঁচ বছর প্রায় বয়স।

এত বড়ো বাড়ির কোথা থেকেও মাধবের সাড়া পাওয়া গেল না। মুহূর্তে সুনয়নীর মুখ শুকিয়ে সাদা হয়ে গেল। পাগলী মাধবকে নিয়ে গেল নাকি কোলে করে ?

'কী দাঁড়িয়ে আছিস হাঁ করে ?' সুনয়নী বিনয়ের উপর মুখিয়ে উঠলেন : 'ছাখ, আমার মাধব গেল কোথায় ?'

'এই তো মা, আমি এখানে।'

'কোথায় ?' সুনয়নী ঝুঁকে নীচু হলেন।

'এই যে।' লাউয়ের মাচার তলা থেকে মাধব এলো বেরিয়ে। মোজা থেকে টুপি—সর্বাঙ্গ তার জামা-কাপড়ে ঠাসা, ব্যাণ্ডেজ-করা বলতে পারো। রোগা, পুঁচকে ছেলে, তাগায়-

কবচে জর্জরিত। শেষ-বয়সের সন্তান বলে এক মুহূর্তও চোখের আড় করা যায় না। তুলোর উপর শুইয়ে তুলোতে করে দুধ খাওয়াতে সাধ যায়। কিন্তু মাধবের স্বভাব বড়ো দুরন্ত। কোল-কাঁখের চেয়ে ধুলো-মাটিই তাকে বেশি টানে।

'কী করছিলে ওখানে?' সুনয়নী প্রায় ধমকে উঠলেন।

'ছিকার করছিলাম।' মাধব খুব একটা বীরত্বের ভঙ্গি করে বললে। কিন্তু সামনেই দাদাকে দেখতে পেয়ে ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে গেল। লজ্জায় মুখ লুকোতে গেল দাদারই কোলের মধ্যে।

দু' পা পিছিয়ে গিয়ে বিনয় জিগগেস করলে: 'তোর হাতে ওটা কী?'

হাতের মস্ত লাঠিটা উঁচিয়ে ধরে বললে, 'ভুন্দুক।'

'ফেলে দাও ওটা, তবে আমার কোলে আসতে পারবে।' বিনয় দু' হাত বাড়িয়ে দিল সামনের দিকে।

বন্দুকের চেয়ে দাদার কোল মাধবের কাছে বেশি লোভনীয়। তাই সে লাঠিটা সহজেই ফেলে দিয়ে দাদার কোলে এলো ঝাঁপিয়ে।

'কী শিকার করছিলে?'

মাধব চোখ বড়ো করে বললে, 'চলুই পাখি।'

'ভুন্দুক দিয়ে হবে কী?'

'ভুন্দুক দিয়ে পাখিল মাথায় একত্তা বালি মারবো।'

'পাখির মাথায় বাড়ি মারবে, পাখির ব্যথা লাগবে না? কাঁদবে না পাখি? তোমার মাথায় যদি বাড়ি মারি, তুমি কাঁদ না?'

কুচকুচে কালো চোখ দুটি অচঞ্চল রেখে মাধব কী কতক্ষণ গভীর চিন্তা করলো। পরে বললে, 'তা হলে আল ছিকাল করবো না। কেমন? কিন্তু বাবা কেন কলে? ছেদিন দ'তা হলিন মেলে এনেছিলো কেন?'

ও-পাশ থেকে সুনয়নী বলে উঠলেন: 'বড়ো হয়ে তুমিও শিকার করবে। এখন শিকার করতে ও-সব বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালে পাগলী এসে ধরে নিয়ে যাবে দেখো।'

হাত দিয়ে দাদার চিবুক তুলে ধরে মাধব জিগগেস করলে: 'পাগলী ধলে নিয়ে যাবে দাদা?'

'ককখনো না। যার দাদা আছে তার আর ভাবনা কী?'

মাধব যেন প্রকাণ্ড আশ্রয় খুঁজে পেল। উৎসাহে দুই চোখ উজ্জ্বল করে বললে, 'তা হলে বলো হয়ে ছিকাল করবো, কেমন?'

'না বড়ো হয়েও শিকার করবে না।'

চোখ দুটি ম্লান করে মাধব বললে, 'পাখিল ব্যথা লাগে বুঝি?'

"হ্যাঁ. যে পাখি ব্যথা পেয়ে মাটিতে পড়ে যাবে তাকে জল দেবে, ছোলা দেবে, ছাতু দেবে। তাকে ভালো করে তুলবে। আর যেই ভালো হয়ে উঠবে তাকে খাঁচায় বন্ধ করে না রেখে আকাশে ছেড়ে দেবে। সে উড়ে যাবে তার বাসায়—আকাশের পথ চিনে চিনে।'

মাধব দাদার কাঁধে চড়ে ভুরু কুঁচকে তাকালো একবার আকাশের দিকে। কোথায় কোন্ পাখি, কিছুই তার চোখে পড়লো না।

দুই

গ্রীষ্মের ছুটিতে বিনয় এসেছে বাড়ীতে, সহরের কলেজ থেকে। গাঁয়ের ছেলেরা এখন সবাই মিলে থিয়েটার করছে, পিকনিক করছে, বিলে আর নদীর চরে গিয়ে পাখি শিকার করছে। কিন্তু ও-সব দিকে বিনয়ের কোনো উৎসাহ নেই। জমিদার-বাড়িগুলির ইঁট-কাঠের এলেকা ছেড়ে সে চলে যায় দূর গ্রামের মধ্যে, যেখানে মাটির ঘরে গরিব চাষাদের বসতি।

হরেকৃষ্ণ তাদের অনেক দিনের প্রজা। জমি-জিরাত এখনো তার কিছু বেহাত হয়নি, খাজনা দিয়ে যাচ্ছে বরাবর।

কানে এলো সেই হরেকৃষ্ণ হঠাৎ আজ বিদ্রোহী হয়ে জমিদারের লোকদের মারপিট করেছে। খবরটা যেন সহজে বিশ্বাস করবার নয়। কাউকে কিছু না বলে বিনয় হরেকৃষ্ণর বাড়ির দিকে রওনা হলো।

গিয়ে দেখলো ব্যাপারটা ঠিক বিপরীত। হরেকৃষ্ণ দাওয়ায় মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে আর মাথার যেখানটায় হাত, সেইখান থেকে রক্ত আসছে বেরিয়ে।

'ব্যাপার কী হরেকৃষ্ণ?'

ভিতর থেকে মেয়েলি কণ্ঠে কে কেঁদে উঠলো: 'আমাদের পুন্নিমে-অমাবস্তেকে ধরে নিয়ে গেছে।'

অনেক কান্না ও কোলাহলের মধ্যে আসল খবর যেটুকু বিনয় সংগ্রহ করলো সংক্ষেপে তা এই ঃ

অজন্মার জন্যে পর-পর চার বছর হরেকৃষ্ণ খাজনা দিতে পারেনি। বাকি খাজনার জন্যে আদালতে নালিশ করে জমিদার ডিক্রি করে নিয়েছে। সেই ডিক্রি জারিতে দিয়ে আদালতের পেয়াদা নিয়ে জমিদারের লোক এসেছিল তার অস্থাবর ক্রোক করতে। তারপর—

'কে জমিদারের লোক ?' বিনয় গর্জে উঠলো।

'নাম জানিনা বাবু। পশ্চিমী গুণ্ডা।'

সে তো রামকিষণ, আমাদের কাছারির দরোয়ান। তারপর ?'

তারপর, ধরবার মতো মালামাল কিছু না পেয়ে শেষকালে তার গোয়ালে ঢুকে দুটো গাই ধরে নিয়ে গেছে।

'আমার পুন্নিমে-অমাবস্যে, বাবু।' পিছন থেকে হরেকৃষ্ণর মা কেঁদে উঠলো।

'হালের বলদ ধরবার নাকি হুকুম ছিল না, বেছে-বেছে তাই আমার দুধেল গাই দুটোকে ধরে নিয়ে গেল।' হরেকৃষ্ণ হাপুস চোখে কেঁদে উঠলো: 'মায়েদের সঙ্গে-সঙ্গে তাদের বাছুর দুটো—আমার শুক্লা আর কৃষ্ণাও চলে যাচ্ছিলো, আমি ছুটে ছিনিয়ে আনতে গেলাম, ঘুরে দাঁড়িয়ে আপনাদের সেই দরোয়ান আমার মাথায় তার হাতের লাঠি দিয়ে এই বাড়ি মারলে।'

বিনয় জিগগেস করলে, 'গরু দুটো আছে কোথায় ?'

'ফেলে দাও ওটা, তবে আমার কোলে আসতে পারবে।'

—১০ পৃষ্ঠা

'এই পাশেই, দেবনাথের বাড়িতে।'

'কে দেবনাথ ? আমাদের প্রজা ?'

'হ্যাঁ, বাবু, আমারই সরিক, খুড়তুতো ভাই। বাবা-কাকাদের আমলে জমা-জমি সব এক সঙ্গেই ছিল, কিন্তু হাল-আমলে আর এজমালি রাখা গেল না। সব ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গেল, বাবু। সেই থেকে দেবনাথের কেবল রোক কী করে আমাকে পথে বসাবে। জামিন-নামা দিয়ে গরু দুটো ও-ই রেখেছে ওর জিম্মায়। ইস্তাহার বেরুলে ও-ই কিনে নেবে আর কি!'

বিনয় এক মুহূর্ত চুপ করে রইলো। বোধহয় মনে-মনে একবার দেখে নিল প্রতিহিংস্র সরিকের চেহারাটা। বললে, 'ডিক্রিতে তোমার দেনা কত ?'

'জারির খরচা নিয়ে গোটা চল্লিশ টাকা হবে। পরোয়ানা পড়ে আদালতের পেয়াদা তাই চাচ্ছিলো বটে।'

'চল্লিশ টাকা দিয়ে দিতে পারলে না ?'

'দিয়ে দিতেই যদি পারবো তবে আমার পুন্নিমে-অমাবস্তেকে ছেড়ে দেব কেন ? লাঠির ঘায়ে কেনই না তবে মাথাটা ফাটাবো বলুন ?'

'এই বা তোমার কী আবদারের কথা!' বিনয় ঈষৎ অসহিষ্ণু গলায় বললে, 'জমি চাষ করবে, তার ফসল খাবে, অথচ তার খাজনা দেবে না ?'

'খাজনা দেব বই কি বাবু!' হরেকৃষ্ণ হাত জোড় করে উঠে দাঁড়ালো, 'তবে, অভাবের সংসার সব সময় সময়মত দিতে পারি

না। তা, দিতে পারি না, খাজনার দায়ে জমি নিলাম করে নিলেই হয়, আমার গরু-বাছুরের গায়ে হাত দিতে আসে কেন ?'

বিনয় খানিকটা অবাক হলো বলতে হবে। বললে, 'জমি তুমি ছেড়ে দিতে চাও নাকি ?'

'কী করবো না ছেড়ে দিয়ে ? নায়েববাবুর কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লুম, আর দুটো মাস আমাকে সময় দিন, মাঠের ধানটা উঠে গেলেই আমি সুদ সমেত সব টাকা আপনার চুকিয়ে দেব। নায়েববাবু শুনলেন না গরিবের কথা। পাছে জমির দিকে গেলে দুটো মাস আমি বেশি সময় পাই, তারি জন্যে চিলের মতো এসে ছোঁ মেরে আমার গরু দুটো ধরে নিয়ে গেলেন। জমি বিক্রি হয়ে গেলে সময়মতো টাকা জমা দিয়ে আবার তা ফিরে পাবার পথ আছে, কিন্তু গো-হাটায় গরু বিক্রি হয়ে গেলে তাদের আর পাব কোথায় ?' হরেকৃষ্ণ আবার উচ্ছ্বসিত কেঁদে উঠলো : 'এ শুধু আমাকে জব্দ করা, আর কিছু নয়।'

'আচ্ছা. তুমি বোসো।' বলে বিনয় ক্ষিপ্র পায়ে বেরিয়ে গেল।

কতক্ষণ পরে সে পুন্নিমে-অমাবস্যেকে নিয়ে হাজির। ঢুঁ মেরে মেরে শুক্লা আর কৃষ্ণা যার-যার মায়ের দুধ খেতে লেগে গেছে।

গরু দুটোকে ফিরে পেয়ে কোথায় হরেকৃষ্ণ উৎফুল্ল হয়ে উঠবে, তা নয়, ভয়ে তার মুখ গেল শুকিয়ে। বড় বড় চোখ করে বললে, 'এ আপনি কী সর্বনাশ করলেন বাবু ? আপনি কি শেষকালে আমাকে ফাটকে পাঠাবেন নাকি ?'

বিনয় তলিয়ে কিছুই বুঝতে পারলো না। বললে, 'ফাটক হবে কেন ?'

'আদালতের ক্রোকী মাল ছিনিয়ে আনলুম, আমাকে ওরা ছেড়ে দেবে নাকি ?'

'তুমি আনলে কোথায় ! আনলুম তো আমি। যা হবার তা আমার হবে।' বিনয় সাহসীর মতো বললে।

কিন্তু হরেকৃষ্ণ তাতে উৎসাহিত হতে পারলো না। বললে, 'যা হবার তা এই গরিবের উপরেই হবে বাবু। জামিন দিয়েছে দেবনাথ, সেই প্রথম আমাকে তিষ্ঠোতে দেবে না। তার পরে আছে জমিদারের পাইক-বরকন্দাজ। তারো ওপরে আছে আদালতের পিওন-পেয়াদা। আমি একেবারে শেষ হয়ে যাব। না, দরকার নেই, গরু আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান। যার গরু তাকে দিয়ে আসুন গিয়ে।'

'যার গরু মানে ?' বিনয় প্রায় ধমকে উঠলো।

'আপনারা যখন ধরে নিয়েছেন, তখন ওরা আপনাদেরই।'

মিনতিময় চক্ষু মেলে অমাবস্যাটা তার গলাটা কখন লম্বা করে দিয়েছিলো হরেকৃষ্ণর দিকে, হরেকৃষ্ণ নিজেরও অলক্ষ্যে তার গলায় আস্তে-আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

'আচ্ছা, আমাদেরই হয়, আমরাই আবার তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।' বলে আর কোনো কথায় কর্ণপাত না করে বিনয় প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল।

এদিকে ঘটনাটা ডাল-পালা মেলে ব্রজলালের কাছে পৌঁছে

গেছে। বিজয়নারায়ণ তাঁর ভিতরের বৈঠকখানায় বসে ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে পাশা খেলছেন। গগন-বিদারণ অট্টরোল চলেছে।

তার মাঝে ব্রজলাল এসে দাঁড়ালেন গাম্ভীর্য ও স্তব্ধতার প্রতিমূর্তি।

'এ কী, তুমি এখানে অসময়ে?' বিজয়নারায়ণ ভুরু কুঁচকোলেন।

'জরুরি একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে।' ব্রজলাল নম্র অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে বললে, 'নইলে অযথা আপনাকে বিরক্ত করতে আসতুম না।'

'তোমার উপর সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়েও কি আমার শান্তি নেই?' বিজয়নারায়ণ তাকিয়ায় ঠেস দিলেন: 'তোমাকে বলেছি তো, যা তুমি ভালো বুঝবে তাই করবে, কোনো-কিছুর মাঝে আমাকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া করবে না। দ্বারী দ্বার রক্ষা করে, গৃহস্বামী ঘুমোয়। তেমনি তুমি জমিদারিটা রক্ষা করবে আর আমি ভোগ করবো।' বলে তিনি পার্শ্বস্থিত গড়গড়ার নলটা মুখে তুলে দিলেন।

'কিন্তু ব্যাপারটা বিনুবাবুকে নিয়ে।' ব্রজলালের গলা অত্যন্ত স্থির ও শান্ত।

'কী আবার করেছে হতভাগা?' তাকিয়া ছেড়ে বিজয়নারায়ণ খাড়া হয়ে উঠে বসলেন।

'ডিক্রিজারিতে হরেকৃষ্ণর দুটো গরু ক্রোক করা হয়েছিলো,

বিনুবাবু গিয়ে জামিনদারের জিম্মা থেকে জোর করে সে দুটো খালাস করে দিয়েছেন।'

'তার অর্থ?' বিজয়নারায়ণের গলায় যেন বাজ ডেকে উঠলো।

'তার অর্থ আর কিছু নয়, সব কিছুর মাঝেই তিনি জমিদারি অত্যাচার দেখতে পান। কোলকাতার কালেজে ঢুকেছেন কিনা, তাই ভাবের ধোঁয়ায় মাথাটা কিছু গরম হয়ে আছে। অত্যাচারিতের পরিত্রাতা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন এমনি একটা ধারণা তাঁকে পেয়ে বসেছে।'

'হুঁ!' বিজয়নারায়ণ সংক্ষেপে একটা হুঙ্কার দিলেন। পরে খেলার দিকে মনোনিবেশ করে বললেন, 'আমি ও-সবের কিছু জানিনা, আমাকে খেলতে দাও নিরিবিলিতে।'

'তবে যা করবার আমিই করবো?'

'নিশ্চয়। তাতে এক পা-ও পিছু হটবে না। দেখিয়ে দেবে, বাইরেই হোক আর ভেতরেই হোক, কোথাও তুমি অশিষ্টকে শাসন করতে ভয় পাও না। ঘরের ছেলে বাইরে চলে যায় তা-ও ভালো, 'তবু মাথা খাড়া রেখে নিজের কর্তব্য ঠিক করে যাবে, বলে দিচ্ছি। আর বলে দিচ্ছি, এ সবের জন্যে আমার খেলায় কোনোদিন ব্যাঘাত ঘটাবে না।'

ব্রজলাল দৃঢ় পায়ে চলে গেলেন। ঘরের মধ্যে আবার খেলার হুল্লোড় সুরু হলো।

কাছারিতে বসে আছেন ব্রজলাল, বিনয় ক্ষিপ্রবেগে ছুটে

এসে তাঁর ডেস্কের উপর চারখানা দশ টাকার নোট বের করে বললে, 'বার করুন হরেকৃষ্ণর হিসেব, হিসেব করে যা পাওনা হয় তা নিয়ে ওর ডিক্রির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে দিন।'

ব্রজলাল এক মুহূর্ত বিনয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। জিগ্‌গেস করলেন, 'এ টাকা তুমি পেলে কোথায় ?'

'যেখানেই পাই না কেন, আপনার কাছে আমি জবাবদিহি দিতে বসিনি। যা বলি তাই শুনুন। হিসেব করে পাওনা টাকাটা হরেকৃষ্ণর নামে উশুল লিখে নিন।'

'পারবো না।'

'পারবেন না কেন ?'

'পারবো না, কেননা টাকাটা হরেকৃষ্ণর বাক্স থেকে আসছে না। আসছে তোমার পকেট থেকে। জামা-কাপড় কিনবে বলে যে টাকাটা তুমি আজ বার করে নিয়েছিলে, এ সেই টাকা।'

'যে টাকাই হোক, আমি বলছি, আপনাকে নিতে হবে।' বিনয়ের গলায় প্রভুত্বের প্রতাপ ফুটে উঠলো।

'এক কথা বার-বার বলা আমার অভ্যেস নয়।' ব্রজলালের গলাও এতটুকু টললো না। 'স্টেটের টাকা থেকেই স্টেটের পাওনা মেটাবে এমন জড়বুদ্ধিকে তোমার বাবা নায়েব করেন নি। যদি রেগে না ওঠো, জিগ্‌গেস করি, হরেকৃষ্ণর জন্যে তোমার এত মায়া কেন ?'

'আপনি ওর গরু ধরতে গেলেন কেন ?' বিনয় ঝাঁজিয়ে উঠলো : 'ওর জমি ধরলে ও কিছু সময় পেত টাকাটা দেবার।

প্রজার কিছুটা আসান হয় সেদিকটা দেখলে কি আপনার মান যায়? যে হাঁস সোনার ডিম পাড়ে, অতিলোভে তার পেটের মধ্যে ছুরি চালালে কী পাবেন জিগ্‌গেস করি?'

'কিন্তু হরেকৃষ্ণ তোমার হাঁস নয়, সে একটি ঘুঘু। চারবছর সমানে সে কাঁচকলা দেখিয়েছে, একটি পয়সাও সে আদায় দেয়নি।' ব্রজলাল মমতালেশহীন উদাসীন গলায় বললেন, 'ডিক্রি পাবার পরেও তার হুঁস নেই। তাগাদার পর তাগাদা, কানই পাতে না। ও পয়লা নম্বরের ধড়িবাজ। ওর ওপর দয়া দেখানো অর্থ জোচ্চুরিকে প্রশ্রয় দেয়া।'

'চুপ করুন। আপনাকে কেউ দয়া দেখাতে বলছে না। বাবা যে জড়বুদ্ধিকে না এনে একটি অর্থ-পিশাচকে নায়েব করেছেন, তা আমার জানা আছে। আর জানা আছে বলেই শুধু হাতে আমি আসিনি, টাকা নিয়ে এসেছি।'

এততেও ব্রজবাবু হাসলেন, হাসিটা নিষ্ঠুর একটা রেখার মতো তাঁর চোখের নীচে ফুটে রইলো। বললেন, 'তবিলের টাকা দিয়েই তবিল ভরাবো এমন ভেলকি আমি শিখিনি। জামার টাকাটা খাজনার টাকা হয়ে ঘরে ফিরবে, আবার খাজনার টাকাটাই জামার টাকা হয়ে যাবে বেরিয়ে, এমন যোগ-বিয়োগে আমি অভ্যস্ত নই।'

ইঙ্গিতটা বিনয় বুঝলো না। ভুরু কুঁচকে জিগ্‌গেস করলে, 'তার মানে?'

'য়্যালজেব্রা শিখেও এটার মানে করতে পারছো না? বলি,

এখন না-হয় পকেট থেকে টাকাটা বের করে দিচ্ছ, কিন্তু কালকেই তো আবার জামা-কাপড়ের বাবদ টাকাটা চেয়ে নেবে! তবে লাভটা কী হলো! নাকের বদলে নরুণও তো পাওয়া গেল না।'

'কিন্তু জামা-কাপড়ের জন্যে কে আবার টাকা চায়!'

ব্রজলাল চমকে উঠলেন, তাকালেন একবার বিনয়ের মুখের দিকে। বললেন, 'জামা-কাপড়ের জন্যে আবার টাকা চাইবে না তুমি?'

'ককখনো না। আপনি কি মনে করেন নিজের লোভ ষোল আনা বজায় রেখে পরের কখনো ভালো করা যায়? না, তাতে য়্যালজেব্রা ছেড়ে টিগোনোমেট্রি লাগে?'

এততেও যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না ব্রজলাল। বললেন, 'তার মানে, নিজের জামা-কাপড় না করে সেই টাকা দিয়ে তুমি প্রজার খাজনা দিয়ে দিচ্ছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। শুনুন, শিখুন।' বিনয় সবিনয়ে বললে।

'কিন্তু গায়ে দেবে কী? পরবে কী?' ব্রজলালের কণ্ঠে যেন ব্যঙ্গের আভাস, অভিনন্দনের উত্তাপ নয়।

'যা আছে তাতেই আমি চালিয়ে নিতে পারবো।'

'কিন্তু কত দিন?'

'যত দিন না আপনাকে আমি তাড়াতে পারবো।' বিনয় তীব্র কটাক্ষ করলো।

'ভালো কথা। টাকাটা তা হলে আমি নিলুম হরেকৃষ্ণর

পাওনার মধ্যে।' ব্রজলালও একবার কুটিল দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন। 'কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, জামা-কাপড়গুলো তোমার খুব বেশি না ময়লা আর ছেঁড়া হয়ে পড়ে।'

'সেই জন্যে আপনার ভীত হবার দরকার নেই।' বিনয় ফিরে যাচ্ছিলো, ঘুরে দাঁড়ালো। 'আমারই বরং ভয় আরামের এই আমিরি ছেড়ে আপনাকে না শীগগিরই কৌপীন এঁটে বনে চলে যেতে হয়।'

তিন

সেদিন নয়নশুকা গ্রামের গরিব এক চাষীকে তাদের ভেতর-বাড়ির উঠোনের এক কোণে পাত পেড়ে খেতে দেয়া হয়েছিলো। ব্যঞ্জনের বৈচিত্র্য ছিল অনেক, কিন্তু লোকটার খাদ্যের চেয়ে পানীয়ের প্রতি বেশি লোভ। দু' এক গরস খায় কি না খায়, উঁচু করে জল খায় এক ঢোক। ভাত লাগবে কিনা জিগ্‌গেস করলে বলে, জল লাগবে।

'কেমন খেলে, ঘনশ্যাম ?'

ঘনশ্যাম জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বলে, 'আ, জল তো নয়, অমৃত !' বলে শূন্যে ঘটি কাৎ করে আকণ্ঠ সে নিজেকে সিক্ত ও স্নিগ্ধ করে নেয়।

বিনয় এলো এগিয়ে। বললে, 'পাতে সব পড়ে রইলো, তোমার একেবারেই পেট ভরলো না।'

'খুব পেট ভরেছে, জল খেয়েই আমার পেট ভরেছে।' ঘনশ্যাম বিশাল একটা উদ্গার তুললোঃ 'কী মিষ্টি জল ! এর কাছে কোথায় লাগে আপনার দই-সন্দেশ !'

'তোমাদের গাঁয়ে বুঝি দই-সন্দেশের খুব ছড়াছড়ি ? খেয়ে-খেয়ে মুখে বুঝি আর রুচি নেই !'

'তা নয় বাবু।' ঘনশ্যাম লজ্জিত বোধ করলো। বললে, 'দই-সন্দেশ আর সবাইর অদৃষ্টে রোজ-রোজ জোটে না বাবু, কিন্তু জল তো মানুষের রোজকার জোটবারই জিনিস। শুধু

মানুষ কেন, গরু-ছাগলেরো জল চাই। কিন্তু আমাদের গ্রামে বাবু, এক ফোঁটাও খাবার জল নেই।'

'বলো কী?'

'হ্যাঁ বাবু, গ্রামের নাম যে নয়নশুকা। নয়ন তার শুকিয়ে রয়েছে। এক ফোঁটাও জল নেই তার চোখে।'

'জল নেই তো খাও কী সব?'

'খাই কী? খাই কাদা।' বলে ঘনশ্যাম বিকৃত মুখে হেসে উঠলো।

'কী সর্ব্বনাশ! নদী নেই ধারে-পারে?'

'আমাদের গাঁ থেকে মহানন্দা প্রায় তিন ক্রোশ। কে যাবে সেখানে? ছোট-ছোট দু'চারটে পাত-কূয়ো যা আছে, তাই আমাদের ভরসা।' ঘনশ্যাম আবার হাসলো। 'ও-গুলোকে কুয়ো না বলে গর্ত্তই বলা উচিত। যা ওখান থেকে ওঠে, তা জল নয়, পাঁক।'

'তাই খেয়ে বাঁচো কি করে?'

'বাঁচি কোথায়! গ্রাম তো প্রায় উজাড় হয়ে গেল! কলেরা তো লেগেই আছে।'

'আর আগুন? আগুন লাগলে করো কী?'

ঘনশ্যাম আবার তেমনি বিকৃত মুখে হেসে উঠলো। বললে, 'করবো কী আবার! গাঁয়ের সবাই একত্র হয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখি।' বলেই শূন্যকৃত ঘটিটা সে আগিয়ে দিয়ে বললে, 'আর একটু জল দিতে বলুন না। একেবারে কানায়-কানায় ভরতি

করে দিয়ে দিতে বলুন। আ, জল যে এমন মিষ্টি হয় তা আগে কোনোদিন জানিনি।'

খাওয়া-দাওয়া সেরে মাথায় ভিজে গামছা ফেলে ঘনশ্যাম যখন বাড়ির দিকে রওনা হয়েছে, নেমে পড়েছে কাঁচা মাটির রাস্তায়, পিছনে পায়ের শব্দে চমকে চেয়ে দেখলো জমিদারের বড় ছেলে, বিনয়। বিস্ময়ের তার শেষ রইল না। বললে, 'এ কি বাবু, আপনি চলেছেন কোথায়?'

বিনয় স্নিগ্ধ মুখে হেসে বললে, 'তোমাদের গাঁয়ে, নয়নশুকায়।'

ঘনশ্যাম যেন ভয় পেল। 'সে কী কথা? নয়নশুকা যে এখান থেকে প্রায় আড়াই কোশ রাস্তা।'

'হ্যাঁ, কাছারির গোমস্তা-দফাদাররাও তাই বললে। মাইল পাঁচেকই হবে। তুমি ভুল বলোনি।'

'ভুল বলিনি তো,—আপনার পাল্কি নিয়ে চলুন। এই রোদ্দুর, পাঁচ মাইল পথ, গাছের ছায়া পাবেন না কোথাও,—ভীষণ কষ্ট হবে যে!'

'আর তোমার?' বিনয় স্নিগ্ধ চোখে চেয়ে জিগ্‌গেস করলো।

'আমাদের কথা ছেড়ে দিন।'

'না ঘনশ্যাম, তোমাদের কথা আর ছেড়ে দেয়া হবে না। তোমার যদি কষ্ট না হয়, আমারো হবে না। তুমি যদি যেতে পারো পায়ে হেঁটে, আমিও পারবো। তোমার আর আমার পথ

আলাদা নয়। চলো, চলো,' বিনয় ঘনশ্যামের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল: 'পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লে কেন?'

সমস্ত ব্যাপারটা যেন ঘনশ্যামের কাছে অভাবনীয় বলে মনে হচ্ছে। অভিভূতের মতো সে জিগ্‌গেস করলে, 'নয়নশুকায় যাবেন কোথায়?'

'কোথায় আবার!' বিনয় হেসে উঠলো: 'তোমার বাড়িতে।'

'আমার বাড়িতে!' ঘনশ্যাম রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। 'সেখানে কী?'

'কিছুই না। তোমার বাড়িতে গিয়ে অতিথি হব শুধু।'

জমিদারপুত্রের নিশ্চয়ই কোনো দুরভিসন্ধি আছে, গ্রামে নিশ্চয়ই আজ কোনো নতুন রকমের উৎপীড়ন স্থরু করে দেবে। কাঁধে ঐ যে কী-ওটা ঝুলিয়ে নিয়েছে চামড়ার দড়ি দিয়ে, ওটার ভিতরে নিশ্চয়ই রয়েছে পিস্তল। আজ আর কারুর রক্ষা নেই।

'আমার বাড়িতে কেন, বাবু?' ভয়ে কাঁচুমাচু মুখে ঘনশ্যাম বললে, 'আমার খাজনা-পত্তর কিচ্ছু বাকি নেই। গোমস্তা-মশাইকে জিগ্‌গেস করবেন চলুন, পাওনা-গণ্ডা আমি সব চুকিয়ে দিয়েছি। দাখিলা আছে আমার ঘরে।'

জোরে-জোরে পা ফেলতে-ফেলতে বিনয় বললে, 'চলো, তাই দেখে আসি তোমার বাড়িতে।'

ঘনশ্যামের কাছে সমস্ত দিনটা মুহূর্তে নিরানন্দ হয়ে গেল। এত জল খেয়ে এসেও তার গলা গেল শুকিয়ে, কাঠ হয়ে!

বিনয়ের কাঁধের ঐ ঝোলানো জিনিসটাই তার উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে।

'রোদ্দুরে আড়াই-পো পথ ভেঙে আমার বাড়ি গিয়ে দাখিলা দেখার চেয়ে কাছারির খাতায় আমার নামে সত্যি উশুল পড়েছে কি না দেখে নেয়াটা অনেক সহজ ছিল।' ঘনশ্যাম দুই হাত জোড করে রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে পড়লো। 'আমি হলফ করে বলতে পারি বাবু, এক আধলা আমার বাকি নেই।'

'তোমার এক আধলাও বাকি নেই বলে তোমার বাড়িতে যাওয়া যাবে না?' বিনয় ধমক দিয়ে উঠলো: 'তোমার বাড়িতে যেতে হলে—হয় মহাজনের মুহুরি, নয় জমিদারের গোমস্তা হতে হবে? এমনি-এমনি যাওয়া যাবে না?'

ঘনশ্যাম কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। পরে অত্যন্ত কুন্ঠিত ভঙ্গিতে বললে, 'কিন্তু আমার বাড়িতে কী আছে?'

'কেন, ছেলেপিলে নেই?'

'তা আছে গোটাকতক কাচ্চাবাচ্চা।'

'তবে আর কী! ওরাই তো আমার সঙ্গী। ওদের মতন আর কে আছে!'

'কিন্তু আপনাকে বসতে দেব কোথায়?'

'কেন, দাওয়ায় একটা চাটাই বিছিয়ে দিতে পারবে না?'

'তা পারবো।'

'তবে আর কী! হাতীর হাওদা তবে কোথায় লাগে!'

'কিন্তু খেতে দেব কী আপনাকে?'

'কেন, জল !'

'জল ?' ঘনশ্যামের মুখ ছাইয়ের মত বিবর্ণ হয়ে গেল। 'আমাদের নয়নশুকার জল দেবো আপনাকে খেতে ?'

'দেবে না ? কাঠফাটা রোদ্দুর মাথায় করে পাঁচ মাইল রাস্তা ভেঙে তোমাদের গাঁয়ে যাচ্ছি, তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে, আর জল চাইলে জল দেবে না খেতে ?'

'ও তো জল নয়, কাদা।'

'তা কী করা যাবে ! যেই দেশে যেমনি।' বিনয় নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় হাসলো। 'কলকাতায় কলের জল, আমাদের মোহনপুরে কালো দীঘির জল, আর তোমাদের নয়নশুকায় না-হয় কুয়োর কাদা। মানুষ হয়ে তোমরা যদি তা খেতে পারো, মানুষ হয়ে আমিই বা তা খেতে পারবো না কেন ? তোমরা কি আমার চেয়ে এতই উঁচু, এতই আলাদা ?'

ঘনশ্যাম চোখে অন্ধকার দেখলো। বললে, 'আপনি তো বাবু শিকার করতে চলেছেন !'

'কে বললে ?'

'কাঁধে ঐ যে আপনার বন্দুক ঝোলানো।' ঘনশ্যাম চার-দিকের মাঠ-প্রান্তর একবার দেখে নিল। বললে, 'পাখী চান তো ? বেলেহাঁস, চাহা, হরিয়াল ? তার জন্যে কষ্ট করে অতদূর যাবেন কেন ? এই কাছেই জলার কাছে বিস্তর পাওয়া যাবে আসুন।'

বিনয় অসহিষ্ণুর মতো বললে, 'আমি পাখি-টাখি চাই না,

আমি চাই জল। বুঝলে ঘনশ্যাম, আমি চাই শুধু নয়নশুকার জল খেতে। তাই এখন একটু জোর-কদমে চলো।'

নয়নশুকায় এসে বিনয় চারদিকে শুধু শুকনো মাঠ দেখলো, আর দেখলো শুকনো মাটির নিদারুণ পিপাসা। জলের জন্যে জায়গায়-জায়গায় মাটি বিদীর্ণ হয়ে গিয়ে যেন মুখ-বিবর থেকে আর্ত জিভ বের করে ধরেছে।

'একি, তোমাদের ধান কই?'

'এবারের এ-ফসলটা বাবু মারা গেল।' ঘনশ্যামের চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে উঠলোঃ 'সময়মতো এবার জল হলো না যে।'

'আবার জল!' বিনয় শুকনো মুখে হাসলো।

'কী করবো বলুন! আকাশ যদি খুসি হয়ে জল দেয় তবেই মাটি বাঁচে, আর মাটি যদি খুসি হয়ে জল দেয় তবেই আমরা বাঁচি, আমরা মাটির মানুষরা। কিন্তু, আকাশ আর মাটি দুইই যদি বিমুখ হয়, তবে আমরা দাঁড়াই কোথায়?'

তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে বিনয় বললে, 'কেন, জমিদারের কাছারিতে!'

কথাটা ঘনশ্যাম কিছুই বুঝতে পারলো না।

'জমিদারের কাছে গিয়ে বলবে অনাবৃষ্টিতে ফসল কিছুই পাইনি, আমাদের খাজনা মাপ দিয়ে দিন; বলবে, জলের অভাবে মরে যাচ্ছি সবাই, জলের বন্দোবস্ত করে দিন। আমরা না বাঁচলে খাজনা পাবেন আপনি কার কাছ থেকে?'

'ও বাবা!' ঘনশ্যাম একেবারে মাথায় হাত দিল। চোখ

বড় করে বললে, 'নায়েববাবু শুনবেন অমন কথা? উল্টে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবেন না?'

'নায়েববাবু বুঝি খুব অত্যাচার করেন?' ভ্রূ কুঞ্চিত করে বিনয় জিগগেস করলে।

'সে কথা আর আপনাকে বলে লাভ কী বাবু? ও সব আমাদের অদৃষ্ট।'

'তোমরা সবাই মিলে গিয়ে বড়বাবুর কাছে নালিশ করতে পারো না?'

ঘনশ্যাম খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো একদৃষ্টে। বললে, 'কী সর্বনাশ! আমরা দেখা করবো বড়বাবুর সঙ্গে? ঘাড়ে আমাদের ক'টা মাথা গজিয়েছে? জিগগেস করলে সাবেক যে-মাথাটা আছে, তাই নায়েববাবু গুঁড়ো করে দেবেন। আমাদের ঘেঁসতেই দেবেন না কাছে।'

'সবাই একসঙ্গে এসে দাঁড়ালে কার সাধ্য তোমাদের পথ বন্ধ করে দাঁড়ায়!'

'ওরে বাবা!' ঘনশ্যাম আবার একটা বিস্ময়ের ভাব করলোঃ 'কোনো কাজে এ-গাঁয়ের লোককে একত্র করতে পারবেন নাকি আপনি?'

বিনয় আর কিছু বললো না। খানিকদূর নিঃশব্দে এগিয়ে এসে হঠাৎ জিগগেস করলে, 'কই, তোমার বাড়ি কদ্দূর?'

'ঐ তো ঐ আমগাছটার নীচে!'

'আর তোমার কুয়ো?'

'বাড়ির গায়েই।'

'চলো, আগে তোমার কুয়ো দেখি।'

সে কী আর দেখবার! যা ঘনশ্যাম বলেছিলো, অগভীর একটা গর্ত। অনেক ঝুঁকে পড়েও তলায় বিনয় তার নিজের ছায়া দেখতে পেল না, জল শুকিয়ে কাদা হয়ে গেছে। বললে, 'গাঁয়ের সব কুয়োই কি এমনি?'

'ঘনশ্যাম সংক্ষেপে বললে, 'সব।'

'আমি ও-সব কিছু জানি না, আমাকে জল খাওয়াও।' বলে বিনয় একটা ছেঁড়া চাটাইয়ের জন্যেও অপেক্ষা না করে ঘনশ্যামের মাটির ঘরের দাওয়ার উপর বসে পড়লো।

'সে কী বাবু, মাটির উপর বসে পড়লেন যে!' ঘনশ্যাম ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

'এখন আমার যা অবস্থা, খাবার জল না পেলে হয়তো শুয়ে পড়তে হবে।'

ঘনশ্যাম চোখে অন্ধকার দেখলো। গোঙানির মত আওয়াজ শুনে বাড়ির ভিতর ও আশ-পাশ থেকে বেরিয়ে এল এক দঙ্গল ছেলে, গামছা মাথায় দিয়ে কারা সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো, থেমে পড়লো।

'আপনার কী হয়েছে বাবু?' দুই হাত জোড় করে ঘনশ্যাম বিনয়ের পায়ের কাছে উবু হয়ে বসে পড়লো।

'কী হয়েছে বলতে পারবো না, তবে জল খেতে না পেলে মরে যাবো, ঘনশ্যাম। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।'

'জল, জল এখানে পাবো কোথায়? আপনি তো নিজের চোখেই দেখলেন কুয়োর অবস্থা। কাদা-ছাঁকা জল আপনাকে দিই কি করে?'

'দিই কি করে!' বিনয় হঠাৎ মুখবিকৃতি করে ধমকে উঠলো: 'ভালো জলের ব্যবস্থা তবে আগে থাকতে করে রাখোনি কেন? জানো না, আমি বা নায়েব বা বড়বাবু যে কোনোদিন চলে আসতে পারি তোমাদের গ্রামে? মাথায় হাত দিয়ে বসে আছ কী! যেমন করে পারো আমাকে জল এনে দাও। তেস্টায় জল খেতে না দিয়ে আমাকে তোমরা মেরে ফেলবে নাকি?'

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বললে, 'এমনি ভাবেই জল-জল করে রমু মোড়লের বড় ছেলেটা মাঠের মধ্যেই মরে গেল।'

'কিন্তু জলের বদলে কাদা তুলে এনে দিলে যে—' ঘনশ্যাম আমতা-আমতা করতে লাগলো।

'কাদা ছাড়া আর উপায় কী?' বিনয়ের ঝিমুনো গলায় হঠাৎ ঝাঁজ ফুটে উঠলো: 'তোমাদের নায়েববাবুকে ধরে এনে একদিন এই কাদা খাইয়ে দিতে পারোনি কেন? এই খরার সময়ে দুপুরবেলায় মাঠের মধ্যে বেঁধে রেখে কেন তাকে বুঝতে দাও নি পিপাসা কাকে বলে? আর, পিপাসায় যখন সে আকণ্ঠ কাঠ হয়ে গেছে, আর যখন জলের জন্যে আর্তনাদ করছে, তখন তার মুখটা কুয়োর মধ্যে গুঁজে দিতে পারোনি কেন? কেন বলতে পারো নি, আগে আমাদের জল দিন, পরে আমরা ফল দেব? নায়েববাবুকে কাদা বানাতে পারো নি, বুঝলুম,

কিন্তু সটান বড়বাবুকে গিয়ে কেন তোমরা জানাও নি তোমাদের অভিযোগ? তাঁকে কেন ডেকে এনে দেখাও নি তোমাদের এগুলো কুয়ো না খোদল? কেন এতদিন এ সব অভাব-অভিযোগের প্রতিবিধান করো নি? করোনি তো, অতিথি-সৎকারও তেমনি করেই করতে হবে। বড়বাবুকে আনতে পারো নি, এনেছ তাঁর ছেলেকে, এখন তবে সেই ছেলেকেই তোমাদের কুয়োর কাদা খাইয়ে দাও। পরে অসুখ হয় তো হবে, মরে যদি যাইই কাদা খেয়ে তো যাব, নইলে তোমাদের হুঁস হবে কী করে? বড়বাবুই বা বুঝবেন কিসে সামান্য সাদা জলের কী দাম! আর তোমাদের নায়েবই বা গায়েব হবেন কিসের ওজুহাতে? যাও, নিয়ে এস আমার জন্যে তোমাদের কুয়োর কাদা, তোমাদের মাটির প্রসাদ!'

ঘনশ্যাম সত্যি-সত্যি কুয়োর মধ্যে দড়ি নামিয়ে দিল।

ছেলেপিলেদের দেখিয়ে বিনয় বললে, 'এরা সব কারা, ঘনশ্যাম?'

'আমারই, বাবু। ও দুটো ভুবন খামারুর।'

কাদার উপর থেকে ভাসমান খানিকটা কালো জল ভাঁড়ে করে সত্যি-সত্যি ঘনশ্যাম বিনয়ের মুখের কাছে তুলে ধরলো। ভাঁড়টা হাতে নিয়ে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বিনয় জিগগেস করলে, 'এই, জল খাবি?'

জিভের ডগা থেকে খানিকটা থুতু ছিটকিয়ে কে-একটা ছেলে বললে, 'থুঃ! গন্ধ!'

কে আরেকজন বললে, 'ওর মধ্যে পোকা ভাসে।'

ঘনশ্যামকে লক্ষ্য করে বিনয় বললে, 'এরাও এই জলই তো খায় দু বেলা ?'

'কী করবে না খেয়ে? যদ্দিন না বৃষ্টি ঝরবে বাবু, তদ্দিন চলবে এই টানাটানি।' অপরাধীর মত অসহায় মুখ করে ঘনশ্যাম বললে।

বিনয় হঠাৎ তার হাতের মৃৎপাত্রটা দূরে ছুঁড়ে দিল। দু' হাত বাড়িয়ে ছেলে-মেয়েগুলোকে সস্নেহ ব্যাকুলতায় ডাকতে লাগলো কাছে। বললে, 'এই, জল খাবি ? খাবি তোরা এই জল ?' বলে কাঁধ থেকে ঝোলানো ফ্লাস্কটা নামিয়ে তার মুখের গ্লাশটা সে খুলে ফেললো: 'খাবি তোরা এই মোহনপুরের কালো দীঘির জল ? টলটলে পরিষ্কার আর ঠাণ্ডা, খাবি ? শরীর জুড়িয়ে যাবে, খাবি তোরা এই জল ?'

প্রথমটা কিঞ্চিৎ দ্বিধা করেছিলো ছেলেরা, কিন্তু বিনয় যখন ছিপি খুলে গ্লাশে জল ঢেলে খেয়ে নিলো খানিকটা তখন কারুর যেন আর বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ-সন্দেহ রইলো না। ঠেলাঠেলি করে সবাই চাইলো আগে এগিয়ে আসতে। অথচ, সম্ভ্রম বাঁচিয়ে দূরত্বও খানিকটা রাখা দরকার।

'ওদের ধরো, ঘনশ্যাম, ওরা যে মারামারি সুরু করে দিল।' পরে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বিনয় বললে, 'গ্লাশ মোটে আমার একটা, ওটা দিয়ে দিতে আরম্ভ করলে এত দেরি হয়ে যাবে যে তোরা সইতে পারবি না। যা, বাড়ি থেকে যার-যার গ্লাশ নিয়ে আয় !'

ঘনশ্যামের ছেলেমেয়েগুলো পড়ি-মরি করে ছুটলো বাড়ির মধ্যে। শুধু বড় ছেলেটাই কাড়াকাড়ি করে গ্লাশ একটা যাহোক আনতে পেরেছে, আর গুলোর কারু হাতে বাটি, কারু হাতে ঘটি, খাড়া বাসনে আর কুলোয়নি বলে শেষেরটার হাতে ছোট একটা কাঁসি!

'আর, তোরা কিছু আনলি না?'

তোরা অর্থ ভুবন খামারুর ছেলেমেয়ে। কুণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে।

মেয়েটাই বড়। বললে, 'আমাদের বাসন-কোসন কিছু নেই।'

'তবে, খাবি কি করে জল?'

শুকনো মুখ আরো শুকিয়ে গেল ভাই-বোনের। বোন বললে, 'হাতে ঢেলে দেবেন, মুখ লাগিয়ে হাত কাৎ করে খেয়ে নেব।' বলে দু'হাত একত্র করে ভঙ্গিটা সে দেখালো।

ভাই বললে, 'আর, আমি হাঁ করে থাকবো, আমার মুখের মধ্যে ঢেলে দেবেন। আপনার গ্লাশ কখনো ছোঁয়া যাবে না।'

বিনয় ছেলেটাকে কোলের মধ্যে টেনে আনলো। বললে, 'আমাকে তো আগে ছুঁয়ে ফ্যাল।' বলে তার ফ্লাস্কের গ্লাশে জল ঢেলে ছেলেটার মুখের কাছে নিয়ে এলো:

'নে, খা। গ্লাশে মুখ ঠেকিয়ে না খেলে জল খাওয়ার সুখ কী!'

ছেলেটা এক ঢোকে খেয়ে ফেললো। মুখ-বুক ভিজে গেছে,

আর উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে চোখ। কী যে হয়ে গেল, তার মধ্যে সে যেন কিছুর হদিস পেল না।

এবার দিদির পালা। সে খেল অতি আস্তে-আস্তে, থেমে-থেমে, চুক-চুক করে।

ছোট ভাই ক্ষেপে উঠলো। 'আমাকে আরেক গ্লাশ। আমি দিদির মত খাবো।'

ছোট ভাই সেই যে দ্বিতীয়বার গ্লাশ ধরলো, আর ছাড়তে চায় না। একটুখানি খায়, আর হাসে, এ-দিক ও-দিক তাকায় আর একটুখানি খায়।

এদিকে ঘনশ্যামের ছেলেমেয়েগুলোর সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করে গেছে। 'আমাদের ঐ ছোট্ট গ্লাশে কিচ্ছু হবে না, আমাদের যার-যার বাসনে ঢেলে দিন।' কাঁসিখানা নিয়ে শেষেরটা পর্যন্ত উন্মত্ত!

ভুবন খামারুর ছেলের কবল থেকে ফ্লাস্কের গ্লাশটা ততক্ষণে বিনয় উদ্ধার করতে পেরেছে। সেটা ঘনশ্যামের কনিষ্ঠটার হাতে চালান দিয়ে সে জল পরিবেষণ করতে বসলো।

রসগোল্লা-সন্দেশ নয়, চকোলেট-আইসক্রিম নয়, সাদা সাধারণ জল, যা জলেরই মত খরচ করবার। চাতকের কাছে বৃষ্টির মতো, তাই যেন এদের কত আরাধনার! বিন্দু-বিন্দু করে খাচ্ছে, মুখের মধ্যে নিয়ে অনেকক্ষণ রেখে দিচ্ছে জিভ ভিজিয়ে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঢোক গিলছে না। যেন কি-এক অমূল্য সম্পত্তি, ভোগ করে সহজে শেষ করে দিতে চায় না।

'দুলিকে আপনি বেশি দিয়েছেন। ও একটা আস্ত ঘটি নিয়ে এসেছে।'

'ঘটি হলে কী হয়, চুমুক দিতে যে গড়িয়ে পড়লো অনেকখানি। পাওয়া নিয়ে কী হবে, খাওয়া নিয়ে হচ্ছে কথা।'

তারপর জলের ভাগ নিয়ে ঝগড়া, কান্নাকাটি।

'নে বাবা, খা যত পারিস।'

শিশুদের মধ্যে বিনয় আরেক কিস্তি বণ্টন করে দিতে বসলো।

পথের উপর দাঁড়িয়ে সামান্য কয়েকজন যারা এই মজা দেখছিলো তাদের এই অমিতব্যয়িতাটা আর সহ্য হলো না। সাহসে ভর করে কয়েক পা এগিয়ে এসে তারা বললে, 'আমাদের অদৃষ্টে দু' এক ফোঁটা প্রসাদ পড়বে না বাবু ?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়।' শিশুগুলিকে নিবৃত্ত করে বিনয় ঐ গ্রাম্য লোকগুলির দিকে এগিয়ে গেল। বাকি জলটুকু বিতরণ করে দিল ওদের মধ্যে। ওরা এমন ভাবে খেল, যেন দেবতার চরণামৃত!

ঘনশ্যাম গিয়েছিলো বাড়ির মধ্যে। বেরিয়ে এসে বিনয়ের কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বললে, 'আর আছে বাবু ছিটে-ফোঁটা ?'

'তুই তো আচ্ছা পেটুক দেখছি।' বিনয় ধমকে উঠলো: 'এই না এক কলসী জল খেয়ে এলি আমাদের বাড়ি থেকে ? তবু তৃপ্তি নেই ? তুই কি জলহস্তী ?'

মুখ কাঁচুমাচু করে ঘনশ্যাম বললে, 'আমার জন্যে নয়, বাবু।'

সেই যে দ্বিতীয়বার মাশ ধরলো আর ছাড়তে চায় না।

—৩৬ পৃষ্ঠা

'তবে, কার জন্যে ?'

'আমার ইস্ত্রি—ঐ দুলি-বুলিদের মায়ের জন্যে। জীবনে এমন পরিষ্কার জল সে খায়নি। আমাকে বলছিলো ঐ দরজার ফাঁক দিয়ে।'

ফ্লাস্কটা শূন্য !

চার

সকালবেলা বিজয়নারায়ণ তাঁর ঘরে বসে আঙুলে মেরজাপ লাগিয়ে সেতারে ঝঙ্কার তুলছিলেন। সামনে ওস্তাদের হাতে বাঁয়া-তবলা।

এমন সময় বিনয় ঘরে প্রবেশ করলো। কোনো ভূমিকা না কেঁদেই বললে, 'আমার কিছু টাকার দরকার, বাবা।'

বিজয়নারায়ণ চোখ না তুলেই বললেন, 'নায়েববাবুকে বলো গে।'

'না, আপনি হুকুমনামা লিখে দিন, টাকার কিছু বেশি দরকার।'

তেমনি নির্লিপ্ত ভাবেই বিজয়নারায়ণ বললেন, 'নায়েব-বাবুকে বললেই হবে।'

আসলে, তাই তো হওয়া উচিত। টাকাটা তার বাবার, আর সে হচ্ছে বড় ছেলে। নায়েববাবু তো মাইনের চাকর। হুকুম তামিল করাই তার কাজ।

বিনয় গেল নায়েববাবুর কাছে। সরাসরি বললে, 'আমার নামে খরচ লিখে শীগগির আমাকে দু'শোটা টাকা দিন।'

'কত?' চশমার কাঁচের উপর চক্ষু তুলে ব্রজলাল জিগগেস করলেন।

তাঁর চোখের সামনে ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমাটা দৃঢ় করে তুলে ধরে বিনয় বললে, 'দু'শো।'

'দু'শো ?' যেন ভীষণ চমৎকৃত হয়েছেন এমনি ভাব দেখিয়ে ব্রজলাল তাঁর হাতের কলমটা ডেস্কের উপর নামিয়ে রাখলেন।

'আজ্ঞে, হ্যাঁ। দু'শো। টু হানড্রেড।'

'চল্লিশ টাকা খয়রাতের পর আবার দু'শো টাকার খেসারৎ?' ব্রজলাল মুখ টিপে হাসলেন।

নিমেষে বিনয়ের সমস্ত রক্ত যেন মাথায় উঠে এল। কর্কশ গলায় বললে, 'তার জন্যে আপনার উদ্বিগ্ন হতে হবে না। কেননা টাকা আপনার বাবার নয়, আমার বাবার।'

ব্রজবাবুর বিশাল মুখমণ্ডল গাম্ভীর্যে বিশালতর হয়ে উঠলো। বললেন, 'সেটুকু মনে রাখলেই যথেষ্ট। টাকা তোমার বাবার, যদ্দিন তিনি বেঁচে আছেন ততদিন তোমার এতে কাণাকড়ির অধিকার নেই।'

'অধিকার আছে কি নেই, সে তর্ক আপনার সঙ্গে করতে চাইনা। কোনো তর্কেরই যোগ্য পাত্র আপনি নন। আপনি মাইনে-করা চাকর, প্রভুর আদেশ পালন করাই আপনার কাজ। সুতরাং বেশি বাকবিস্তার না করে টাকা ক'টা বের করে দিন।'

'হ্যাঁ, মাইনে-করা চাকরই বটে, কিন্তু যুবরাজের নয়, স্বয়ং সম্রাটের।' ব্রজবাবু মুখে হাসির একটু আভা আনলেন যেটা বিদ্রূপের বিদ্যুৎ-ঝলক।

'সেই সম্রাটেরই আদেশ, টাকা আপনাকে এক্ষুনি দিয়ে দিতে হবে।'

'বেশ আশ্বস্ত হলুম।'

'আশ্বস্ত হলেন মানে ?'

'আশ্বস্ত হলুম এই ভেবে যে যুবরাজ বুঝেছেন তাঁর হুকুম তামিল করবার আমার কথা নয়।' ব্রজবাবু তাঁর বসবার ভঙ্গিটা একটু শিথিল করে নিলেন। 'কিন্তু টাকাটা কী জন্যে চাই শুনি ?'

অত্যন্ত রূঢ়, রুক্ষ গলায় বিনয় বললে, 'তা জানবার আপনার কথা নয়। বাবা বলেছেন দিয়ে দিতে, দিয়ে ফেলেই আপনি খালাস। এর বেশি কিছু প্রশ্ন করাটা আপনার বেয়াদবি।'

কানের পিঠ চুলকে অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে ব্রজবাবু বললেন, 'তা, ও-রকম প্রশ্ন করাটা আমার স্বভাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। আর, তোমার বাবাও আমার এই বেয়াদবিটা চিরকাল মার্জনা করে এসেছেন।'

ভুরু কুঁচকে বিনয় জিগগেস করলো ঃ 'তার মানে ?'

'তার মানে, তোমার বাবা যখন তাঁর ব্যক্তিগত খরচের জন্যে আমার কাছে এসে টাকা চান তখন তাঁকেও ঐ প্রশ্নটা করে থাকি। সদুত্তর না পেলে আবেদন প্রত্যাখ্যান করে দি।'

'আপনার এতদূর আস্পর্ধার কারণ ?'

'কারণ তোমার বাবারই নির্দেশ।' ব্রজবাবু আবার সোজা হয়ে ঋজু ভঙ্গিতে বসলেন। 'অবিশ্যি, প্রায় সব সময়েই তাঁর উত্তরটা সদুত্তর হয়, তবু যখন দেখি নিজের প্রমোদ-বিলাসের জন্যে তিনি একটা খুব বড় রকম অঙ্কপাত করেছেন, আমি

প্রায়ই সেটা নিষ্ঠুর হাতে খর্ব করে দি ! এটুকু অধিকার তিনি আমাকে সেধেই দিয়েছেন। ঘোড়া যে মাঝে-মাঝে এলোমেলো ছুটতে পারে এটুকু জেনেই বলগা উনি ছেড়ে দিয়েছেন আমার হাতে। তাই বলগা যখন জোরে টেনে ধরি, দুর্দান্ত ঘোড়া বশীভূত তো হয়-ই, খুসিও হয়। স্টেটের কিসে হিত হবে ওঁর চেয়ে আমি ভালো বুঝি ওঁর এই বিশ্বাসই আমাকে স্পর্ধিত করেছে।' ব্রজবাবু কুটিল দৃষ্টিতে একটু হাসলেন। 'স্বয়ং সম্রাট যদি উত্তর দিতে পারেন, যুবরাজই বা দিতে পারবেন না কেন ?'

'ককখনো না।' বিনয় একেবারে ফেটে পড়লো। 'আপনি বলতে চান এ টাকা আমি আমার প্রমোদ-বিলাসের জন্যে চেয়ে নিচ্ছি ?'

ব্রজবাবু বিচলিত হলেন না। স্নিগ্ধ হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, কেননা পরের দুঃখনিবারণের স্বপ্ন দেখাটাও একটা বিলাসিতা।'

বিনয় স্তব্ধ হয়ে গেল। একটু-বা অসহায় বোধ করলো নিজেকে। তবু নিজের কর্তৃত্বের জায়গা থেকে এক চুল ভ্রষ্ট না হয়ে বললে, 'তা নিয়ে আপনার মাথা ঘামাতে হবে না। টাকা দেবেন কিনা তাই বলুন।'

'বললুম তো টাকা নেবার কারণটা না যতক্ষণ গ্রাহ্য হচ্ছে—'

অসহ্য। বিনয়ের সমস্ত রক্ত যেন ফুটতে লাগলো। বললে, 'কারণটা কি আপনার কাছে গ্রাহ্য হতে হবে ?'

ব্রজবাবু নীরবে শুধু হাসলেন।

'বাবার কাছে গ্রাহ্য হলে চলবে না ?'

'না।' ধীরে অথচ দৃঢ়ভাবে ব্রজবাবু মাথা নাড়লেন।

বিনয় ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এবং সটান গিয়ে উপস্থিত হলো বিজয়নারায়ণের ঘরে। বিজয়নারায়ণ শ্লথ ভঙ্গিতে বসে গড়গড়া টানছেন, তামাকের মন্থর আবেশে দুই চোখ তাঁর স্তিমিত হয়ে এসেছে।

'বাবা!' বিনয়ের তীক্ষ্ণ ডাকে বিজয়নারায়ণের তন্দ্রা ভেঙে গেল।

'কি!' বিজয়নারায়ণ বিরক্ত মুখে বললেন, 'আবার কী হলো ?'

'নায়েববাবু টাকা দিলে না।'

বিজয়নারায়ণ চুপ করে রইলেন। কিন্তু স্তব্ধতার ভিতরে অনুভব করলেন বিনয় যেন কি-একটা প্রতিবিধানের জন্যে প্রতীক্ষা করছে। চোখ চেয়ে তাই বললেন, 'দেয়নি, তা আমি কী করবো ?'

'আপনি বললেও কি সে দেবে না ? সে কি আপনার চাকর নয় ?' বিনয়ের নাসারন্ধ্র দুটো ফুলতে লাগলো।

'আমি বলেছিলুম নাকি দিতে ?' বিজয়নারায়ণ তাঁর ধূম-মলিন মস্তিষ্কে একটুও যেন আলোর আভাস খুঁজে পেলেন না। বললেন, 'তা যখন দেয়নি, ভালো বুঝেছে বলেই দেয়নি।'

'ভালো বুঝেছে!' বিনয় ব্যঙ্গ-মিশ্রিত স্বরে বললে, 'কাজটা ভালো কি মন্দ, তা কি ও আমাদের চেয়ে ভালো বুঝবে নাকি ?'

'তা ও বোঝে বই কি ভালো।' বিজয়নারায়ণ নির্বিবাদে সায় দিলেনঃ 'অনেক দিনের পাকা লোক। অনেক ঝড়-ঝাপটা থেকে বাঁচিয়ে নৌকো ও অনেক বার ঘাটে পৌঁছে দিয়েছে। তাই ওর হাতে হাল ছেড়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি। টাকা যখন সে দেয়নি তখন নিশ্চয়ই বুঝতে হবে টাকাটার তোমার কোনো সত্যি প্রয়োজন ছিল না।'

'কারণটা না শুনেই?'

'কারণটা না বললে তা আর শোনা যায় কি করে?'

বিজয়নারায়ণ আর বিনয় একসঙ্গে তাকিয়ে দেখলো, ঘরের মধ্যে স্বয়ং ব্রজলাল। অল্প একটু হেসে ব্রজবাবু বললেন, 'কিন্তু, তবু, কারণটা আমি জানি।'

'জানেন?' বিনয় ঘাড় বেঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো।

'হ্যাঁ, নয়নশুকা গ্রামে তুমি একটা টিউবওয়েল করে দিতে চাও।'

কি করে খবরটা ব্রজবাবু সংগ্রহ করলেন, বিনয়ের তা নিয়ে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হলো না। সে শিখার মতো জ্বলে উঠলো। বললে, 'সেই কাজটা কি খুবই মন্দ? সমস্ত গ্রাম জল খেতে না পেয়ে শুকিয়ে মরে যাচ্ছে, সেখানে একটা টিউবওয়েল বসানো কি আমাদের কর্তব্য নয়? যারা আমাদের পিপাসায় জল দেবে, তাদেরই পিপাসায় জুটবে পাঁক—এ ব্যবস্থাটা আপনি বরদাস্ত করতে বলেন নাকি? শেষকালে নিজেদের তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে যে ওদের চোখের জলটুকুও জুটবে না।'

'না জুটুক, ব্রজবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, 'তাই বলে গ্রামে-গ্রামান্তরে টিউবওয়েল আমরা বসাতে পারবো না। টিউবওয়েল বসানোটা আমাদের কাজ নয়।'

'আমাদের কাজ নয়, বাবা?' বিনয় সরাসরি বিজয়নারায়ণের কাছে আবেদন করলো: 'সমস্ত গ্রাম পুড়ে মরবে আর আমরা টানা-পাখার নীচে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে নিশ্চেষ্ট হয়ে তাই দেখব? কোনোই প্রতিবিধান করবো না? প্রজারা কি জমিদারের অপত্য নয়? ওদের আমরা শোষণ করবো, শাসন করবো, কিন্তু পালন করবো না, কষ্ট থেকে বাঁচাবো না ওদের?'

'আঃ!' বিজয়নারায়ণ বিরক্তিসূচক শব্দ করে উঠলেন। তন্দ্রালস চোখদুটো একবার একটু মেলে ধূমময় তাম্রকূটে আবার নিমগ্ন হয়ে গেলেন। বললেন, 'শোনই না নায়েববাবু কী বলেন।'

'না, তা আমাদের কাজ নয়।' ব্রজবাবু শান্ত অথচ নিষ্ঠুর কণ্ঠে বললেন, 'আমরা বুদ্ধদেবের পার্ট প্লে করতে বসিনি। জমির বদলে খাজনা নেয়া আমাদের কাজ, দৈবদুর্যোগে ফসল মারা যায় কারু কোনো বছর, পাওনা কিছু রেয়াৎ দিতে পারি বড়জোর; কিন্তু তাই বলে ঘরে যার চাল নেই তার চাল ছেয়ে দিয়ে আসবো কিম্বা কুয়ো যার শুকিয়ে গেছে তার জন্যে দীঘি কেটে দিয়ে আসবো এমনধারা বদান্যতা দেখানো আমাদের কাজ নয়।'

'তবে সেটা কার কাজ?' বিনয় কথাটা যেন ছুঁড়ে মারলো।

'গ্রামে যে ইউনিয়ন বোর্ড আছে তার। বছরে যে সে ট্যাক্সো নেয়, সে কি অমনি ? গাঁয়ে-গাঁয়ে দুটো-একটা করে সে টিউব-ওয়েল বসিয়ে দিতে পারে না ? না, সমস্ত টাকাটাই তার প্রেসিডেণ্টের পেটের কুয়োর মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে ?' ব্রজবাবু তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটি করলেন।

কিছুক্ষণ বিনয় কোনো কথা বলতে পারলো না। মনে হলো তাকে যেন কে চড় মেরে বসিয়ে দিলে। তবু সে বললে—দ্বিধাজড়িত দুর্বল গলায় বললে, 'কর্তব্যই কি সব ? দয়া-মায়া, ভালোবাসা বলে কি কিছু নেই ? এতে আমার দায় নেই বলে কি এতে আমার দান করা নিষেধ ? চোখের সামনে কারু দুঃখ দেখলে কি সহানুভূতি না জেগে জাগবে আপনার তর্কবুদ্ধি ? পথের ধূলায় শিশু আছাড় খেয়ে পড়ে কেঁদে উঠলে আশ্রয় দেবার জন্যে আপনার হাত কি আপনা থেকেই এগিয়ে যায়, না, হাত গুটিয়ে বসে-বসে ভাবেন, আমি তুলবো কেন, তুলবে ওর মা, কাঁদুক ও ততক্ষণ ?'

ব্রজবাবু নির্লিপ্তভাবে হাসলেন। বললেন, 'তাই তো বলছিলুম এও একরকম একটা বিলাসিতা ছাড়া কিছু নয়।'

'বেশ বিলাসিতাই হলো। বিলাসিতারো রকম-ফের আছে। কারুটা ভোগ, কারুটা না-হয় ত্যাগ। মন্দ কি, পিপাসার্তকে জল দেবার একটা অত্যাশ্চর্য বিলাসিতাই না হয় করা গেল। দিন, তাই দিন,' বিনয় নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত পাতলো : 'আমার একটা ব্যক্তিগত বিলাসিতার জন্যেই টাকাটা ফেলে দিন চোখ বুজে।'

'আবার বিলাসিতা! বিজয়নারায়ণ তাঁর বিহ্বল তন্দ্রার ভিতর থেকে চমকে উঠলেন: 'বাবুগিরি করে দু' পুরুষ বিষয়-আশয়ের আর্ধেকের বেশি ফুঁকে দিয়ে গেছে। এ বংশে আর বিলাসিতা চলবে না। যেটুকু আছে, রয়ে-সয়ে খরচ করতে হবে।'

'চলবে না?' বিনয়ের কণ্ঠে আওয়াজটা যেন আর্তনাদের মত শোনালো।

কেউ কোনো কথা বললেন না। বিজয়নারায়ণ নিবিষ্ট মনে ধূমোদ্গীরণ করতে লাগলেন আর ব্রজলালের চাপা ঠোঁটের কোণ থেকে বাঁকা-বাঁকা হাসির ধারালো সূঁচ বেরুতে লাগলো।

'এত চলে—আর এ চলবে না?' বিনয় যেন আপন মনে বলে উঠলো: 'এত যেখানে অজস্রতা, সেখানে দরিদ্রের প্রতি এটুকু দয়াই শুধু অপব্যয়?'

বলে দ্রুত পা ফেলে সে অন্দরমহলে গেল, যেখানে সুনয়নী টেবিলের সামনে বসে হাতে সেলাইর কল চালাচ্ছেন।

'মা, সামান্য দু'শোটা টাকা আমি পেতে পারি না?' বিনয় শেষ আশ্রয় মার কাছে গিয়ে হাত পাতলো।

ববিনে সূতো ভরতে-ভরতে সুনয়নী বললেন, 'দু'শোটা টাকা সামান্য বলতে চাও?'

'অতি সামান্য, মা। যা তাদের অভাব, তার কাছে ঐ দু'শোটা টাকা কিছুই নয়।'

'কাদের অভাব?' সুনয়নী চোখ তুলে স্পষ্ট করে চাইলেন বিনয়ের দিকে।

'নয়নশুকার প্রজাদের। ও-অঞ্চলে ওদের খাবার এতটুকু জল নেই। কুয়োগুলো সব শুকিয়ে কাদা হয়ে গেছে।' বিনয়ের দুই চোখ করুণার আভায় কিঞ্চিৎ আর্দ্র হয়ে এল: 'আমি ওদের ওখানে একটা টিউবওয়েল বসিয়ে দিতে চাই, মা। জলের অভাবে ওরা মরে যাচ্ছে।'

কলের দিকে মুখ ফিরিয়ে এনে সুনয়নী বললেন, 'কেউ মরেছে বলে তো শুনিনি।'

'কেউ বেঁচে আছে বলেও শোনা যায়নি কখনো।' বিনয় যেন একটা দীর্ঘশ্বাস দমন করলো: 'ওদের বাঁচা আর মরা— শালগ্রামের শোয়া আর বসার মতো। বেঁচেই যদি ওরা থাকতো তবে কোনদিন আমাদের এই মোহনপুরের কালো দীঘির জল ওরা গণ্ডূষে শুবে নিত, মা। ওরা যে তৃষ্ণার্ত তাই কি ওরা জানে?'

'যতো জানো তুমি!' সুনয়নী বিরক্তি-ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে বললেন, 'নিজের পড়াশুনা ছেড়ে গ্রামে-গ্রামে টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছ বুঝি?'

'তাই তো একমাত্র কাজ হওয়া উচিত, মা। আমরা যারা রাজা, তারা তো কেবল প্রজার দোরে-দোরে ঘুরে বেড়াবো, কার কী দুঃখ কার কী অভাব তার প্রতিকার করবার জন্যে।' বিনয় সুনয়নীর আরো কাছে এসে দাঁড়ালো: 'আমি পড়াশোনা একদম ছেড়ে দেব, মা।'

'কী করবে তবে? গুণ্ডামি?' সুনয়নী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন।

'হ্যাঁ, আপাতত তাই।' বিনয় ম্লান একটু হাসলো। 'ব্রজ-নায়েবকে প্রথমেই ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বিতাড়িত করবো, মা।'

'তার মানে?'

'তার মানে নিজেই জমিদারি দেখব। আমারি শিল-নোড়া দিয়ে আমারি দাঁতের গোড়া ভাঙবে, তা কিছুতেই আমি সহ্য করতে পারছি না। জমিদারিটা যে আমার আর ও যে সামান্য মাইনেখোর চাকর, তা ওকে প্রত্যক্ষ বুঝিয়ে না দেয়া পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই।'

'জমিদারিটা তোমার হলো কবে?' সুনয়নী বক্র দৃষ্টিক্ষেপ করলেন।

'এখনো হয়নি বটে, কিন্তু একদিন তো হবে।'

'যখন হবে তখন। ততদিন চুপ করে বসে থাকো।' সুনয়নী আবার সেলাইয়ে মনোনিবেশ করলেন।

'না, বসবো না; বাবা বহুদিন বাঁচুন, থাকুন আমাদের মাথার উপরে, খুবই ভালো কথা; কিন্তু জমিদারিটা আমি তাঁর হাত থেকে শীগগির ছিনিয়ে নেব।'

কী-এক অজানা আশঙ্কায় সুনয়নীর মুখ থেকে একটা ভয়ার্ত শব্দ বেরুল: 'তার মানে?'

'তার মানে খুবই সহজ, মা। দুর্বল হাতে কখনো দুরন্ত ঘোড়ার বলগা ধরা যায় না। ইতিহাসে দৃষ্টান্ত তার বিরল নয়। সাজাহানের হাত থেকে আওরঙ্গজেবও একদিন জোর করে ঘোড়ার রাশ ছিনিয়ে নিয়েছিলো।'

'হঠাৎ তোমার অমন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হতে চাইবার কারণ ?'

'কারণ ঐ ব্রজনায়েবের কর্তৃত্ব দিনে-দিনেই সীমা ছাড়িয়ে চলেছে। বাবাকে দুর্বল, অলস বা বিলাসী পেয়েই ওর এতটা আস্ফালন। সে-আস্ফালনটা ওর শাসন করা দরকার।'

সুনয়নী তাঁর কণ্ঠস্বর থেকে রুক্ষতাটা মুছে ফেললেন। বললেন, 'কেন, ব্রজবাবু তো একজন পাকা নায়েব, খুব কাজের লোক। ওঁর আমলে জমিদারির অনেক উন্নতি হয়েছে, কত বাজেয়াপ্ত মহাল কত কায়দা-কানুন করে উনি ফিরিয়ে এনেছেন। যেখানে আদায় হতো আগে শতকরা ত্রিশ টাকা খাজনা, ওঁর আমলে এখন সেখানে আদায় হচ্ছে শতকরা পঁচানব্বই টাকা। একমাত্র লাঠির ঘায়েই কত দুর্দান্ত প্রজা বশ মেনেছে—'

'ঐ লাঠির জোরেই, মা। কিন্তু লাঠি খেয়ে দুর্বল প্রজা যখন মাটিতে পড়ে, 'জল' 'জল' বলে কেঁদেছে তখন তোমাদের ঐ ধুরন্ধর নায়েব তার গলায় এক বিন্দু জল ঢেলে দেয়নি। না, মা, আমার জমিদারিতে আমি অমন অত্যাচার কখনো হতে দেব না।'

সুনয়নী নিজেরো অলক্ষ্যে আবার বাঁকা করে হাসলেন। বললেন, 'সব সময়ে জমিদারিটা যে তুমি তোমার একার বলে ভাবছ!'

'কেন, একারই তো!'

'কেন, মাধব নেই ?'

'মাধব!' বিনয় হেসে উঠলো: 'ও আবার আমার কোনো-দিন অবাধ্য হবে নাকি?' বলেই সে গলা ছেড়ে হাঁক পাড়লো: 'মাধব! মাধব! মেধো!'

মাধব তখন একটা লাঠিকে ঘোড়া বলে কল্পনা করে নিজেই সেটাকে টেনে নিয়ে ঘরে-বারান্দায় ছুটোছুটি করছিলো, দাদার ডাকে কাছে এসে বললে, 'আমায় ডাকছ দাদা?'

'হ্যাঁ, ডাকছি।' অত্যন্ত নৃশংস শাসকের ভঙ্গি করে বিনয় বললে, 'তুই আমার কথা শুনবি কি শুনবি না?'

'ছুনবো।' মাধব পরম আপ্যায়িতের মত ঘাড় হেলালো।

'তবে বোস।'

মাধব বসলো উবু হয়ে।

'দাঁড়া।'

মাধব দাঁড়ালো।

'হাস্ হি-হি করে।'

'হি-হি-হি-হি।' মাধব হাসলো একটা কাষ্ঠ হাসি।

'কাঁদ্ ভেউ ভেউ করে।'

কান্নাটা মাধব ফোটাতে পারলো না। বরং, সত্যিকারের সরল হাসি সে হেসে উঠলো।

'কাঁদবি না তুই, দুষ্টু ছেলে? আমার তুই কথা শুনবি না?' বলে বিনয় মাধবের গালে এক চড় বসিয়ে দিল।

আর, মাধব উঠলো ভেউ-ভেউ করে কেঁদে।

অমনি তাকে দুহাতে বুকের মধ্যে তুলে নিল বিনয়। দাদার

কাঁধের মধ্যে মুখ গুঁজতে পেয়ে কান্না থামাতে মাধবের এক নিশ্বাসেরো সময় লাগলো না। তার মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বিনয় বললে, 'এ তো একটা সার্কাস হয়ে গেল—তুই জোকার সাজলি!'

দুই চোখে জল নিয়ে মাধবের তখন সে কী সলজ্জ হাসি!

কোল থেকে তাকে নামিয়ে দিয়ে বিনয় বললে: 'আমাদের দু' ভায়ের জমিদারিতে আমরা এত অবিচার কখনো ঘটতে দেব না। কড়ায়-ক্রান্তিতে পাওনা-গণ্ডা যেমন আদায় করে নেবো, তেমনি প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশাও নিবারণ করবো। ফলও নেবো, মূলও নেবো, তারপর গাছ মরে গেলে তার কাঠও নেবো—জমিদারিটা এমনি একটা শুধু লাভের ব্যবসা নয়। দায়িত্বটাও কিছু আছে আমাদের। সুতরাং, নয়নশুকায় টিউব-ওয়েল বসাবার জন্যে আমার প্রথম কিস্তিতে দুশোটা টাকা চাই।'

সুনয়নী আকাশ থেকে পড়লেন: 'আমি টাকা পাবো কোথায়?'

'তুমি ব্রজনায়েবকে হুকুম করবে। বলবে, খোকাকে এখুনি দুশো টাকা বার করে দিন।'

সুনয়নীর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো: 'সর্বনাশ! আমারো হুকুম সে বাতিল করে দিতে পারে।'

'করুক দেখি বাতিল। তারপর কেমন সে দাঁড়িয়ে থাকে দু পায়ে, দেখি আমি।'

'তার চেয়ে তোমার আব্দারটা বাতিল করে দেয়াই উচিত মনে হচ্ছে।' সুনয়নীর কণ্ঠস্বর ঈষৎ কঠিন শোনালো।

'তার মানে, পাইয়ে দেবে না আমাকে টাকাটা ?'

'না, দরকার বোধ করি না।'

'দরকার বোধ কর না ?' বিনয় বিস্ময়ে অস্ফুট শব্দ করে উঠলো : 'সমস্ত গ্রাম পিপাসায় কাঠ হয়ে যাচ্ছে, সেখানে জলের দরকার নেই ?'

'জানি না। তবে যেটাকা খরচ করায় ব্রজবাবুর মত নেই, সহজেই বোঝা যাচ্ছে তা দিয়ে স্টেটের কোনো উপকার হবে না।'

'সমস্তটাই স্বার্থ ?' দুঃখে ও রাগে বিনয় যেন অসহায় বোধ করতে লাগলো : 'পৃথিবীতে পরের উপকার বলে করণীয় কি কিছুই নেই বলতে চাও ?'

'আমি কিছুই বলতে চাই না। শুধু এইটুকু বলতে চাই, পড়াশোনার সময় পড়াশোনা করো।' সুনয়নী জোরে হুইল ঘোরাতে লাগলেন।

'যত পড়াশোনা করি ততই তো বুঝি জীবনটা শুধু পড়াশোনার জন্যেই নয়।' বিনয় শেষ বার কণ্ঠে কাতরতা আনলো : 'কোনো রকমেই কি দুশোটা টাকা আমি পেতে পারি না ? জমিদারের ছেলে, অনেক কিছু আব্দার করেই তো তারা টাকা পেয়ে থাকে—কত রকম বাবুগিরিতে, কত রকম উচ্ছৃঙ্খলতায়—'

'অন্যায় আব্দার করলে চলবে কেন ?

'তৃষ্ণার্তকে জল দেয়া যদি অন্যায় হয়, তো হোক, তবু যেমন

করে পারো, টাকাটা আমাকে পাইয়ে দাও, মা। আমি যে ওদের কথা দিয়ে এসেছি।'

উদাসীন গলায় সুনয়নী বললেন, 'ব্রজবাবু যখন 'না' বলেছেন তখন তা আর হয় না।'

'হয় না ? আচ্ছা বেশ, আমি চললুম—' বিনয় দরজার দিকে অগ্রসর হলো।

কথাটা বৈরাগ্যের না আতঙ্কের, সুনয়নী ঠিক করতে পারলেন না।

'শোন্, শুনে যা, বিনু।' তাঁর কণ্ঠস্বরে এতক্ষণে শাসন-কর্ত্রীত্বের নিষ্ঠুরতার বদলে মাতৃস্নেহের ব্যাকুলতা ফুটে উঠলো।

বিনয় ফিরে দাঁড়ালো।

'কোথায় যাচ্ছিস ?'

'জানি না।'

বিনয় বেরিয়ে গেল দ্রুত পায়ে।

পাঁচ

সমস্ত দিন বিনয়ের আর দেখা নেই। এখানে-ওখানে পাইক-বরকন্দাজরা ঘুরে এসে বললে, দাদাবাবুর সন্ধান পাওয়া গেল না।

অভিজ্ঞের মত উদাসীন হাসি হেসে ব্রজলাল বললেন, 'যাবে আর কদ্দূর? খিদে পেলেই চলে আসবে দেখবেন।'

বিজয়নারায়ণ তন্দ্রাবিষ্ট চোখে বললেন, 'তা ছাড়া আবার কী! মার উপর রাগ করে এ বয়সে আমিও একবার রিক্ত হাতে বেরিয়েছিলুম রাস্তায়, কিন্তু নস্যির কৌটোটা ফেলে গিয়েছিলুম বলে আমাকে ফের ফিরতে হয়েছিল।' বলে তিনি নিজে যত না হাসলেন তার চেয়ে বেশি হাসালেন সমাগত তাঁবেদারদের। পরে ব্রজলালের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর মুখে বললেন, 'এইটুকু শুধু দেখো, বিদঘুটে কিছু করে বসে আমার না নাম ডোবায়!'

সামান্য মানহানির ভয়ের চেয়েও বেশি ভয় সুনয়নীর। অবয়ব নেই, তবু যেন কেমন একটা অতিকায় আতঙ্ক! কোথা থেকে কেমন করে কী যেন একটা সর্বনাশ ঘটে যাবে তিনি যেন তার আভাস পাচ্ছেন অথচ আকৃতি পাচ্ছেন না! ভয় পেয়ে মাধবকে কেবল বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরছেন বারে-বারে।

যে যাই বলুক, মাধব জানে তার দাদা কোথায়। তার কেমন ধারণা হয়েছে সে-কথা বলে ফেললেই দাদাকে এরা ধরে

বেঁধে ফেলবে, মারবেও বুঝি বা। তাই সে প্রাণপণে চুপ করে আছে। একটু যদি সে ছাড়া পায়, তার চারদিকের পাহারাটা একটু যদি আলগা হয়, সে তবে ছুটে এখুনি দাদার কাছে গিয়ে হাজির হতে পারে ; ষড়যন্ত্রীর মতো দাদার কানে-কানে গিয়ে বলে, তুমি এখান থেকে পালাও দাদা, ওরা ওই এসে পড়লো।

তাদের বাড়ির পিছনে যে আম-কাঁঠালের বাগান, তারই গা ঘেঁসে একটা জঙ্গল, তারই মধ্যে আছে একটা চূণ-বালি-খসা পুরোনো পোড়ো ঘর। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আছে একটা পায়ে-চলা পথ, কিন্তু দুঃসাহসী ছাড়া কেউ সহজে ও পথ মাড়াতে চায় না। তার কারণ জঙ্গলের অন্ধকার তত নয়, যত ঐ পোড়ো ঘরখানা। পূর্বতন যুগের দুর্দান্ত জমিদাররা ঐ ঘরটা আগে কী জন্যে ব্যবহার করতেন তার বহু-বিচিত্র প্রবাদ এখনো প্রচলিত আছে, কিন্তু বর্তমানে পঞ্চাশ বছরেরো উপর ঐ ঘরটা ভূতের আস্তানা বলেই প্রসিদ্ধি পেয়ে এসেছে। কিন্তু ভূতের সঙ্গেই বন্ধুতা করার সাধ বড় বিনয়ের। তাই সে কাউকে না জানিয়ে যেটুকু নেহাৎ না করলেই নয় সেই ঘরের সে সংস্কার করে নিয়েছে, নিয়ে এসেছে কোত্থেকে একটা টেবিল আর চেয়ার, দড়ির একটা খাটিয়া, খানকতক বই আর লেখবার সরঞ্জাম। এইখানে, জঙ্গলের অন্ধকারে ও নিভৃতিতে বসে সে লেখে আর পড়ে, আর তার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে থেকে-থেকে যে-সব প্রকাণ্ড সমস্যা উদ্ভূত হয় তার সমাধানের পথ খোঁজে।

ভূত বলে যে কিছু নেই তাই দেখাবার জন্যে বাড়ির ও

বাইরের অনেককেই সে এই ঘরে নিয়ে এসেছে। একদিন মাধবকেও সে নিয়ে এসেছিল।

যে যাই বলুক, মাধবের দৃঢ় বিশ্বাস—দাদা ঐ ঘরে আছে লুকিয়ে। যদিও চাকররা বলছে ও-ঘরের দরজায় তালা লাগানো, মাধব ঠিক জানে, দাদা এক সময় না এক সময় নিশ্চয়ই ফিরে আসবে সেখানে; তার বোধের অগম্য শিশুমন থেকে কে বলছে, আজকের এই অভিমানের দিনে অমনি একটি শান্তি ও স্তব্ধতারই উপর দাদার বেশি টান পড়বে।

ঠিক সন্ধ্যেটার আগে। মা স্নানের ঘরে, চাকর রমু একটু আড়াল হয়েছে কী কাজে—মাধব চারদিকে চেয়ে ক্ষিপ্র হাতে প্যাণ্টের দু-পকেট লজেন্সে আর চকোলেটে বোঝাই করে নিল, আর তারো চেয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়লো ঘর থেকে।

রাস্তা-ঘাট সমস্ত মাধবের চেনা, এমনি বেপরোয়াভাবে, অথচ ধরা না পড়ে যায় এমনি সতর্ক দৃষ্টিতে সে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলো। লোক-চলাচল নেই, ফিকে-হয়ে-আসা দিনের আলোয় নির্জন বনে গা কেমন ছমছম করে ওঠে; কিন্তু মাধবের এতটুকুও ভয় নেই, কেননা খানিকদূর এগিয়েই তো সে দাদাকে ধরে ফেলবে। দাদা বলে ডেকে উঠলেই তো বুকের মধ্যে ভয় থাকে না।

ঐ সেই ঘর। বাইরে থেকে দরজায় আর তালা লাগানো নেই। যা মাধব ভেবেছিলো, ঘরের মধ্যে দড়ির খাটিয়ার উপর দাদা শুয়ে আছে—অত্যন্ত পরিশ্রান্ত চেহারা, সমস্ত গায়ে মাটি মাখা।

'দাদা!' দরজার বাইরে থেকে আনন্দিত কলকণ্ঠে মাধব ডেকে উঠলো।

কোনো একটা পাখি উঠলো কিনা ডেকে, মর্মমূল পর্যন্ত চমকিত হয়ে বিনয় চারদিকে চাইতে লাগলো।

'এ কি, মাধব? তুই কোত্থেকে?' ছুটে এসে বিনয় মাধবকে বুকের উপর আঁকড়ে ধরলো।

'তোমাল জন্যে চলে এসেছি একা-একা। তোমাল জন্যে খাবাল নিয়ে এসেছি।' মাধবের কুচকুচে কালো দুটি চোখের তারা গর্বে ও আনন্দে ঝকঝক করে উঠলো।

'খাবার? কই দেখি?'

'তুমি হাঁ কলো, চোখ বোজো—'

পরম বিশ্বাসে বিনয় চোখ বুজে হাঁ করলো, আর মাধব তার প্যাণ্টের পকেট থেকে একমুঠ লজেন্স আর চকোলেট বের করে বিনয়ের মুখের মধ্যে চালান করে দিলে।

'আমার আর কী চাই? আমার তো তুইই আছিস।' মাধবকে বুকে করে বিনয় চলে এলো ঘরের মধ্যে। বসলো তার খাটের উপর, খেতে-খেতে মাধবের মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'ছাখ্ মাধব, আমাদের চাইনে এই জমিদারি, এই বিত্ত-বেসাত, এত সব প্রভুত্ব-প্রতিপত্তি। যে ধন নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে পরের প্রয়োজনে লাগে না, সেই ধনে আমাদের রুচি নেই। যে ঐশ্বর্য নিজের পূর্ণতাকে বড় করে না দেখিয়ে অন্যের দারিদ্র্যকেই বড় করে দেখায়, সে-ঐশ্বর্য তো আবর্জনা! আমরা

গরিব হবো, রিক্ত হবো, কিন্তু হাতে আসবে আমাদের শক্তি, চোখে জ্বলবে আমাদের আগুন। আমরা সমস্ত সবহারারা নতুন করে পৃথিবী নির্মাণ করবো, মাধব। তুই আসবি আমার সঙ্গে ?'

পাঁচ বছরের শিশু দাদার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়েছিল এতক্ষণ, হঠাৎ একটা বোধগম্য প্রশ্নের নাগাল পেয়ে সে উল্লসিত হয়ে উঠলো। বললে, 'যাবো দাদা।'

'কোথায় যাবি বল তো ?' বিনয় হাসলো।

ঈষৎ লজ্জিত হয়ে ঘাড় নামিয়ে মাধব বললে, 'সে অনেক দূলে। বেলাতে।'

'না, মাধব, অনেক দূরে নয়, আপাতত কাছেই, গ্রামের মধ্যে। আর, বেড়াতে নয়, কাজ করতে।' বিনয় আবার গম্ভীর মুখে স্বগতোক্তি সুরু করলো : 'আজ আমি সমস্ত দিন কাজ করেছি, খন্তা দিয়ে মাটি কুপিয়েছি। তৃষ্ণার্ত গ্রামবাসীরা আমার সঙ্গী হয়েছে। আমার আজকের উপবাস ওদের উপবাস, ওদের আজকের তৃষ্ণা আমার তৃষ্ণা। নয়নশুকায় আমরা মস্ত বড় দীঘি কাটবো, মাধব।'

এতক্ষণে মাধব আবার আরেকটা বোধগম্য কথার নাগাল পেয়েছে। বললে, 'দীঘি ? তাতে মাছ থাকবে দাদা ?'

'সব থাকবে। কিন্তু জানিস মাধব, আমি বড়ো শ্রান্ত। মাটি কুপিয়ে আমার গা-হাত-পা সব ব্যথা করছে।'

'কোথায় ? বলো না, আমি হাত বুলিয়ে দি।' মাধব পরম স্নেহে বিনয়ের হাতের উপর হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

বললে, 'তুমি বালি চলো দাদা, বিছানায় ছোবে চলো, নমুকে বলবো তোমাল পা তিপে দিতে।'

'আমার মনে হয় কী জানিস মাধব ? মনে হয় ও-বাড়িতে আমার আশ্রয় নেই—ঐ আরাম, ঐ সুখ, ঐ বিলাস আমার জন্যে তৈরি হয়নি। আমার জন্যে ধুলো আর কাদা, ঝড় আর বৃষ্টি আর পথ আর পথ—কে জানে, হয়তো পৃথিবীতেই আমার আশ্রয় নেই।'

কে যেন খুব কাছে থেকে অস্ফুটস্বরে হঠাৎ বলে উঠলো : 'আছে। আয় আমার সঙ্গে।'

বিনয় আপাদমস্তক শিউরে উঠলো। চেয়ে দেখলো সামনের জানালার ওপারে কার মুখ! কেমন উদ্‌ভ্রান্ত দুই চক্ষু! কেমন অদ্ভুত একটা হাসি!

'কে ?' বিনয় চমকে উঠলো।

'আমি রে আমি।' এই যেন তার সমস্ত পরিচয়। বলে সেই মূর্তি হাতছানি দিয়ে হাসিমুখে ডাকতে লাগলো বিনয়কে : 'আয় আমার সঙ্গে।'

ঘরের কোণ থেকে লাঠিগাছটা তুলে নিয়ে বিনয় মাধবকে কোলে করেই একলাফে বাইরে চলে এল, কিন্তু মূর্তিকে সম্পূর্ণ করে দেখে ভয়ের চেয়ে বিস্ময়ই তার বেশি হতে লাগলো। এ আর কেউ নয়, সেই বুড়ি, পাগলি, জগমোহিনী!

'তুমি এখানে এসেছ কেন ?' বিনয় ধমকের সুরে প্রশ্ন করলো।

'আমার গোপালের খোঁজে, বাবা।'

'কে তোমার গোপাল ?'

জগমোহিনী অদ্ভুত করে হাসলো। বললে, 'এই যে, গোপাল আমার সামনে দাঁড়িয়ে।'

বিনয় ভেবেছিল বুড়ি বোধহয় মাধবকে লক্ষ্য করছে, কিন্তু চেয়ে দেখলো তার একাগ্র দৃষ্টি তারই মুখের উপর দৃঢ়-নিবদ্ধ।

'তুমি তো পাগল!' বিনয় উপেক্ষার সুরে বললে।

'কে পাগল নয় এ দুনিয়ায় ? দুনিয়ার যিনি মালিক তিনিও তো পাগল হয়ে সব সৃষ্টি করেছেন। পাগল না হবো তো মাটির গোপালের মাঝে মানুষের গোপালকে খুঁজবো কেন ? আয় বাবা, আয় আমার সঙ্গে', বুড়ির গলায় অদম্য আন্তরিকতা ফুটে উঠলো, 'আমার ঘরে এসে আসন পেতে একবারটি বোস আমার চোখের সুমুখে।' বলে সে ক্ষিপ্র পায়ে এগুতে সুরু করলো।

'কোথায় যাবো তোমার সঙ্গে ?'

'আমি যেখানে থাকি—'

'কোথায় থাক ?'

'হরিহর গাঙ্গুলি, টোলের যে পণ্ডিত এখানকার, আমি তার দূরসম্পর্কের পিসি হই। যখন আসি তার ওখানেই উঠি ; কিন্তু বাবা, গরিবের সংসার, বেশি দিন পুষতে পারে না।'

'আমি ওখানো যাবো কেন ?' বিনয় অসহিষ্ণুর মতো বললে, 'সাহায্য-টাহায্য করবার মতো কিছু আমার সঙ্গে নেই।'

'আরে, সাহায্য কি শুধু পয়সা দিয়েই হয় ?' জগমোহিনীর

চোখ ছলছল করে উঠলো: 'আমি আজ গোপালের পূজো করেছি, সমস্ত দিন আজ আমার উপোস, সন্ধ্যের সময় গোপালকে ভোগ দিয়ে আমি একটু প্রসাদ নেব।'

'ভালোই হলো, আমিও আছি আজ উপোস করে।' বিনয় হেসে উঠলো: 'দেখছ না, তাই ননী খাচ্ছি।' বলে সে হাঁ করে মুখের মধ্যেকার চকোলেট দেখালো।

'সমস্ত দিন উপোস করে আছিস? কেন?' জগমোহিনীর গলায় উদ্বেগ ফুটে উঠলো: 'অসুখ করেছে? হাতে-পায়ে-গায়ে এত মাটি মেখেছিস কেন? রাজার ছেলে না তুই?'

'রাজার ছেলের চেয়ে পথের ভিখারীতে অনেক শান্তি। এখন চলো দেখি পথ দেখিয়ে।' বিনয় তাড়া দিল। পরে মাধবের দিকে চেয়ে বললে, 'কিন্তু মাধব? মাধবের কী হবে?'

'আমিও তোমাল ছঙ্গে গোপালের পূজো দেখতে যাবো।' মাধব বায়না ধরলো।

'তাই। তুইও চল আমার সঙ্গে, আমার সাথী।' বলে বিনয় মাধবকে তার কাঁধের উপর তুলে নিল। দাদার কাঁধে চড়ে মাধবের আনন্দ আর ধরে না।

বিনয়ের বুঝতে কিছু বাকি নেই, জগমোহিনী জমিদার-বাড়ির তরফ থেকে কঠিন কোনো একটা ঘা খেয়েছে, কী একটা নির্মম অত্যাচার হয়েছে তার উপর, এবং তারই প্রতিকার খুঁজতে সে সেদিন নায়েববাবুর দ্বারস্থ হয়েছিল, আর কে না জানে, দুঃস্থ ও দুর্গতের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়াটাই নায়েববাবু

চমৎকার বাহাদুরি মনে করেন! কী তার দুঃখ, কিসের তার অভিমান, কেন সে এত বঞ্চিত—এত সব জানবার জন্যেই জগমোহিনীর সে পিছু নিয়েছে।

জঙ্গলটা পার হয়ে গেল নিঃশব্দে। পাকা রাস্তা পেয়ে বিনয় প্রকৃতিস্থ ভাবে জিগগেস করলে, 'আপনার গাড়ি কই? গরুর গাড়ি?'

জগমোহিনী অদ্ভুত করে হাসলো। বললে, 'গাড়ি? আমি তো বাবা রাজদর্শনে যাচ্ছি না, আমি কাঙালিনী, যাচ্ছি আমার গোপালের মন্দিরে। আমার গাড়ি লাগবে কেন? যত দীর্ঘ আমার পথ তত বিস্তৃত আমার তীর্থক্ষেত্র।'

ঠিক পাগলের মতো কথা নয়, অথচ ঠিক স্বাভাবিক যেন বলা যায় না। কোন্ অতলান্ত এর বেদনা তা কে বলবে?

আসলে সেখান থেকে হরিহর ঠাকুরের টোল বেশি দূরের রাস্তা নয়। খড় দিয়ে ছাওয়া ছেঁচা বাঁশের বেড়া-ঘেরা কাঁচা মাটির ঘর। দাওয়ায় উঠে জগমোহিনী হঠাৎ হাঁক পাড়লো: 'ও হরি, ও রাঙা বৌ, দেখে যাও, তোমাদের ঘরে আজ কে এসেছে।' বলতে-বলতেই সবাইকে নিয়ে বুড়ি চৌকাঠ ডিঙিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লো।

ভিতরের বারান্দার এক কোণে মাদুর বিছিয়ে বসে হরি ঠাকুর প্রদীপের আলোয় শাস্ত্র পড়ছিলো আর আরেক কোণে তার স্ত্রী কুপির আলোয় রান্না করছিলো তোলা উনুনে; জগমোহিনীর কণ্ঠস্বরে সচকিত হয়ে চেয়ে দেখে বিস্ময়ে তারা

যুগপৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল—একজনের হাত থেকে শিথিল হয়ে খসে পড়লো বই, আরেক জনের হাত থেকে হাতা। একই সঙ্গে দু'জনের মুখ থেকে বেরিয়ে এল একই শব্দ: 'কী সর্বনাশ!'

বিনয় ভাবলো, এমন প্রকাণ্ড পদমর্যাদাবান হয়ে তারা দুই ভাই নগণ্য এক দরিদ্র টোলের পণ্ডিতের বাড়ি এসেছে, তাতেই এরা ভয় পেয়ে গেছে নিশ্চয়। ভাবছে কত বড় অপমান-অবহেলার মাঝে না জানি টেনে নিয়ে এসেছে তাদের! তাই সে অভয় দিয়ে বললে, 'তাতে কী, বড়োলোক হতে পারি, কিন্তু গরিবের মতোই সমান খিদে পায়, আর খিদের সময় খুদ-কুঁড়া পেলে তাকেই মনে হয় অমৃতের চেয়েও অমৃত।'

'দাঁড়িয়ে কী দেখছ, রাঙা বৌ! ঠাঁই করে গোপালকে আমার খেতে দাও।' জগমোহিনী ব্যাকুল হয়ে উঠলেন: 'শুনছ না, গোপাল সমস্ত দিন অভুক্ত রয়েছে!'

হরি পণ্ডিত আর তার স্ত্রী নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলো। জগমোহিনী নিজেই জায়গা করে পাশাপাশি দু'খানা আসন পেতে দিলেন। বসলো বিনয়, আর তার গা ঘেঁসে মাধব, এখন কেমন একটু-লাজুক, একটু-বা অপ্রসন্ন।

হরি পণ্ডিতের স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বিনয় বললে, 'দিন কী রান্না হয়েছে। গরিবের অন্ন শুধু আন্তরিকতার গুণেই সুস্বাদু হয়ে ওঠে। কিছুমাত্র কুণ্ঠা করবার কারণ নেই, সত্যি আমি অভুক্ত আছি সমস্ত দিন।'

দু' থালায় করে জগমোহিনী নিজেই ভাত বেড়ে আনলেন—

গরম ভাত, ঘি, আলু-ভাতে আর পটলভাজা। 'অপূর্ব!' বিনয় গ্লাসের জলে হাত ধুয়ে ভাতের থালায় বাঘের থাবা বসালো।

গরম দেখে মাধবের উৎসাহ এসেছিলো ঠাণ্ডা হয়ে, তাই জগমোহিনী নিজেই এসে ভাত মেলে ছোট-ছোট গ্রাসে তাকে খাইয়ে দিতে লাগলো।

মাঝপথে বিরাট এক ঢোক জল খেয়ে নিয়ে বিনয় বললে, 'আগে খেয়ে নি, পরে আপনাদের সমস্ত কাহিনী শুনবো। শুনবো, জমিদারের অত্যাচারটা আপনাদের কাছে কোন্ চেহারা নিয়ে দেখা দিয়েছে! আপনারা ভয় পাবেন না, একটি কথাও লুকোবেন না আমার কাছে; আমি সমস্ত অত্যাচারের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াবো।'

শুনতে হলো না; দেখতে হলো স্বচক্ষে।

হঠাৎ একটা তুমুল অট্টরোল উঠলো: 'এইখানে, এইখানে।'

অমনি অনেকগুলি মিলিত কণ্ঠের আগুন লেলিহান হয়ে উঠলো: 'মারো, বাঁধো, ছিনিয়ে নিয়ে এসো।'

প্রথমেই দেখা দিলেন ব্রজলাল, আক্রমণ-উদ্যত বাঘের মতো তাঁর ভঙ্গি। এক মুহূর্তও দ্বিধা না করে ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনি মাধবকে ছিনিয়ে নিলেন তার আসন থেকে, কর্কশ কণ্ঠে মুখিয়ে উঠলেন জগমোহিনীর উপর: 'এ-সব কী হচ্ছে আপনার? বিষ খাওয়াচ্ছেন শেষকালে?'

'বিষ!' ঘি-মাখা গরম ভাতের দিকে বিস্ময়-বিমূঢ় চোখে বিনয় চেয়ে রইলো।

বুড়ি জগমোহিনীর চোখে অশ্রুর বান ডেকে এল। বললে, 'বাছাদের মুখে আমি বিষ তুলে দেব ?'

'নইলে, আর মতলোব কী আপনার ? কেন তবে এদেরকে ডেনে এনেছেন খাবার লোভ দেখিয়ে ?' ব্রজলালের চক্ষু দুটো জ্বলতে লাগলো।

'আজ আমার গোপালের পূজো ছিল। গোপাল খুঁজতে আমি পথে বেরিয়েছিলুম। কী সৌভাগ্য কে জানে, হঠাৎ দেখা পেয়ে গেলুম। দেখলুম, রাজার ছেলে পথের ভিক্ষুকের মতোই আজ ক্ষুধার্ত। বুঝলুম, ছদ্মবেশে এই আমার গোপাল। তাই ভোগ দেবার জন্যে কাঙালের ঘরে তাকে ধরে নিয়ে এসেছি।' দুই বিগলিত চোখে জগমোহিনী উদ্বেল হয়ে উঠলো।

'কিন্তু এই ছোট ছেলেটাকে তার মার আঁচলের তলা থেকে চুরি করে এনেছেন কেন ? আপনার উদ্দেশ্য কী ?' ব্রজলালের কথাগুলি যেন চাবুকের মতো বাড়ি মারতে লাগলো।

এর উত্তর দিল বিনয়। বললে, 'মাধবকে কেউ চুরি করে আনেনি, মাধব আপনিই এসেছে তার দাদার সঙ্গে। আর যতক্ষণ তার দাদা আছে সামনে ততক্ষণ তার মঙ্গলের জন্যে সামান্য এক অনাত্মীয় কর্মচারীর চিন্তা করবার দরকার নেই।'

ব্রজলাল রাগ করলেন না, শুধু তাঁর অভ্যস্ত সেই সূক্ষ্ম ও শাণিত হাসিটুকু হাসলেন। বিনয়কে ইঙ্গিত করে বললেন, 'ইনি না-হয় সন্নেসী হয়েছেন, চাষা-ভুষোর দলে গিয়ে ভর্তি হয়েছেন, কিন্তু জমিদারের এই ছেলেকে আপনি কোন্ সাহসে

মাটির উপর বসিয়ে ঐ কুৎসিত মোটা চালের ভাত খাওয়ান ?' বলে এবার ইঙ্গিত করলেন মাধবকে।

এবারও বিনয়ই উত্তর দিল। বললে, 'জমিদারের ছেলের কিসে মর্যাদা হয় বা না হয়, তা গৃহীই হোক আর সন্নেসীই হোক, জমিদারের ছেলেই ভালো জানে, তার মাইনে-করা নায়েব-গোমস্তারা নয়।'

'সাধু! সাধু সর্দার!' ব্রজলাল ডেকে উঠলেন বাইরের দিকে চেয়ে।

'হুজুর!' হাতে লাঠি, কোমরে রুমাল বাঁধা সাধু সর্দার একলাফে এসে উপস্থিত। সাধু হচ্ছে জমিদারের আটপ্রহরী অর্থাৎ এক কথায় অষ্ট প্রহরের ভৃত্য।

'একটা কলাপাতা কেটে নিয়ে এসে খোকাবাবুর পাতের ঐ মাখা ভাত কটা আর যা ঐ সব উপকরণ আছে আশে-পাশে —সব বেঁধে নিয়ে চল। ডাক্তারখানায় পাঠাতে হবে দেখবার জন্যে ও-সবের মধ্যে বিষ আছে কিনা।' পরে হঠাৎ সবাইকে ফেলে ব্রজলাল নিরীহ হরি পণ্ডিতের প্রতি ঝাঁজিয়ে উঠলেন: 'আপনাকে শেষবারের মত বলে দিয়ে যাই পণ্ডিত-মশাই, যদি আপনার এই পিসিটিকে গ্রাম থেকে না তাড়ান তবে আপনাকেই আমাদের তাড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে।'

বস্তুত তারই আজ একটা হেস্তনেস্ত ব্যবস্থা করবার জন্যে ব্রজলাল তাঁর দলবল নিয়ে এসেছিলেন। মাধবকে খোঁজাখুঁজি করতে সমস্ত বাড়ি যখন তোলপাড় হচ্ছে, দলে-দলে লোক যখন

বেরিয়ে গেছে দিকে-দিকে, তখন একটা উড়ো খবর তাঁর কানে এল যে বুড়ি জগমোহিনীই মাধবকে চুরি করে পালিয়েছে।

ব্রজলাল চোখে বিভীষিকা দেখলেন। স্থির করলেন, মাধবকে শুধু উদ্ধার করলেই চলবে না, হরি গাঙ্গুলির ঘরে আগুন লাগিয়ে তাকে একেবারে নিরাশ্রয় করে দেবেন, যাতে কোনোদিন তার চালের তলায় তার বুড়ি পিসি, জগমোহিনী না মাথা গুঁজতে আসতে পারে। কিন্তু এখানে এসে বিনয়কে তিনি দেখতে পাবেন এমনটি কখনো ভাবতে পারেন নি। তাই তাঁর সমস্ত সঙ্কল্প বিনয়ের উপস্থিতির বাধায় চাপা পড়ে গেল। কাজ ছেড়ে তাই তাঁর শরণ হল বাক্যে। হরি পণ্ডিতের দিকে তর্জনী তুলে তিনি ফের বললেন, 'এখনো সাবধান হন বলে দিচ্ছি।'

ভয়ে ও বিনয়ে হরি পণ্ডিত এতটুকু হয়ে গেল। করজোড়ে বললে, 'কোথায় ফেলবো বলুন পিসিটাকে? সংসারে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। রাজপুত্রের মতো ছেলেগুলি ওঁর একে-একে বিদায় নিয়ে গেল, এখন ছাই ফেলতে আমি শুধু এক ভাঙা কুলো, আমার কাছে যদি আশ্রয় চাইতে আসে তবে কি বুড়ো পিসিকে তাড়িয়ে দেব বলতে চান?'

'নিশ্চয়।' ব্রজলাল নির্মমের মতো বললেন, 'আর তা যদি না হয়, তবে ভবিষ্যতে আশ্রয়খানাই আপনার ভূমিসাৎ হয়ে যাবে। ছেলেপুলে পিসি-মাসি সবাইকে নিয়ে আপনাকে তখন গাছতলায় দাঁড়াতে হবে—এ আমি বলে গেলাম।'

জগমোহিনীর দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধস্বরে বিনয় বললে,

'এ-সবে আপনি ভয় পাবেন না। এখানে আপনার আশ্রয় যদি না মেলে, আপনি সটান আমাদের বাড়ি চলে যাবেন। বাড়িতে ঢোকবার আগে কাছারির নায়েব-গোমস্তার পরামর্শ নেবেন না, আমি বিনয়ের কাছে এসেছি, আমি বিনয়কে চাই, এ-কথা বললে কারু সাধ্য নেই আপনাকে বাধা দেয়! বাড়িতে আমরা অনেক অযোগ্য কর্মচারীকেই আশ্রয় দিয়েছি, একজন দুঃস্থ অনাথ দরিদ্র বিধবাকে স্থান দিতে আমাদের উদারতার কিছু অভাব হবে না—আমাদের ওখানেই আপনি চলে আসবেন স্বচ্ছন্দে।'

ব্রজলাল কর্ণপাত করলেন না। তেমনি অনম্র, রূঢ় ভঙ্গিতে হরি পণ্ডিতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আর, আমার কথার অবাধ্য হয়ে এঁকে আবার এ-গাঁয়ে ঠাঁই দিয়েছেন বলে আসছে-মাস থেকে আপনার টোলের বরাদ্দ বৃত্তি বন্ধ হয়ে গেল।' বলে তিনি মাধবকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

মাধব এতক্ষণ থ হয়ে ছিল। তার শিশুমনে এটুকু শুধু বুঝতে পাচ্ছিল ঐ বুড়ি পাগলি তাকে আর তার দাদাকে ঘোরতর একটা বিপদের মধ্যে এনে ফেলেছে। বাড়ির এরা সব ঠিক সময়ে এসে পড়তেই তারা বেঁচে গেছে এ-যাত্রা। কিন্তু বাইরে বেরুবার সময় সে বুঝতে পারলো, দাদা তার সঙ্গে আসছে না, দাদা থেকে গেল সেই বুড়ির কাছে, সেই অজানিত বিপদের মধ্যে। ব্রজলালের বাহুর মধ্যে থেকে মাধব আকুলি-বিকুলি করে উঠলো: 'দাদা, দাদা,—দাদাকে নিয়ে এস—'

ব্রজলাল ভ্রূক্ষেপও করলেন না। বেয়ারারা পালকি নিয়ে এসেছিল, মাধবকে কোলে নিয়ে তিনি তার মধ্যে প্রবেশ করলেন।

আপদে-নিরাপদে, মাধবের মনে হলো দাদার কোলের মতো সুখের আশ্রয় তার কিছু নেই, তাই সে আর্তস্বরে চীৎকার করতে লাগলোঃ 'আমি দাদার কাছে যাব, দাদার কাছে যাব—'

সেই চীৎকার বাতাসে মিলিয়ে যাবার পর বিনয় শান্তমনে ভাতের থালায় মন দিল।

যন্ত্রণায় বিবর্ণ জগমোহিনীর মুখ, বাষ্পাচ্ছন্ন দুই চক্ষু, অবসন্ন তাঁর বসবার ভঙ্গি। অতিশয় নিস্তেজ গলায় তিনি বললেন, 'সব জুড়িয়ে গেছে যে—'

অল্প একটু হেসে বিনয় বললে, গোপালের ভোগের আবার ঠাণ্ডা আর গরম কী! সবই সমান মিষ্টি।' বলে সে গোগ্রাসে খাওয়া সুরু করলো।

এমন সময় সাধু ফিরলো কলাপাতা নিয়ে মাধবের পরিত্যক্ত থালার ভাত নিয়ে যেতে, ডাক্তারখানায় পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। কেউ তাকে কিছু বললো না, অদূরে বসে থালার থেকে ভাত কটি সে পাতায় ঢালতে লাগলো, আর কতক ভয়ে কতক বিস্ময়ে আড়চোখে দেখতে লাগলো বিনয়কে।

ঘি-মাখা ভাত কটি ঢালা হয়েছে পাতায়, ভাজা-ভাতেগুলিও নেয়া হয়েছে আশে-পাশে, পাতা মুড়ে সাধু উঠতে যাবে অমনি

বিনয় অতি-আকস্মিক একটা বজ্রাকার শব্দ করে উঠলো ঃ 'খবরদার !'

সেই শব্দে সাধুর প্রাণ গেল উড়ে, গা পড়লো ঢলে, গুটোনো পাতা গেল উন্মোচিত হয়ে।

'খবরদার ! এই ভাত তুই নিয়ে যেতে পারবি না।' বিনয় পিঠ খাড়া করে বললো ঃ 'এই ভাত তোকে খেতে হবে।'

'খেতে হবে !' সাধুর চোয়াল দুটো ভেঙে গিয়ে প্রকাণ্ড একটা হাঁ বেরিয়ে পড়লো। গলার ভিতর থেকে আওয়াজ বের হলো ঃ 'এর মধ্যে বিষ আছে।'

'থাক্, তবু তোর খেতে হবে। দেখছিস না, আমি কেমন খাচ্ছি !'

'মরে যাব যে বাবু।' সাধু কেঁদে ফেললো।

'আর যদি না খাস তা হলেও মরবি।' বিনয় জামার আস্তিন গুটোলো। বললে, 'আমার সঙ্গে যদি মরিস, তবে ভয় নেই, আমার সঙ্গে স্বর্গেও যেতে পারবি। নে, খা, ঘটির জলে হাত ধুয়ে নে আগে—'

'কিন্তু যদি মরে যাই ?'

যদি মরে যাস, ভূত হয়ে নায়েববাবুর কাঁধে চাপবি, তাকে এ-জায়গা থেকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবি জঙ্গলে। নে, চেটেপুটে খেয়ে নে সব, যদি তোর জীবনের মায়া থাকে এতটুকু।'

সাধু ভয়ে-ভয়ে ভাতের পাতায় হাত দিল। নায়েববাবুর কথাটাই খাঁটি না চোখের সামনে দাদাবাবুর খাওয়াটাই খাঁটি,

সে ঠিক কিছু বুঝতে পারলো না। হাতে করে কিছু ভাত সে নাকের নীচে তুলে ধরে শুঁকতে লাগলো, পরে কি মনে করে হঠাৎ সে তার মুখের গহ্বরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। আশ্চর্য, বিষক্রিয়ায় শরীর তার অবশ হয়ে এলো না, বরং কি-রকম যেন ভালই লাগছে মনে হচ্ছে! আবার তুলে দিল সে আরেক গ্রাস। আবার।

বিনয় হাসি চেপে রেখে বললে, 'বিষমাখা ভাত কোথায়, যদি জিগগেস করেন নায়েববাবু, তবে বলবি উদরের রসায়নাগারে পাঠিয়ে দিয়েছি সেগুলো। বুঝলি?'

খাওয়ার আনন্দে বিভোর সাধু স্বচ্ছন্দে ঘাড় হেলিয়ে বললে, 'আচ্ছা।'

ছয়

নয়নশুকায় মণ্ডল প্রজাদের বসতির পিছনে প্রায় বিঘে পাঁচেক খাস-পতিত জমি পড়ে ছিল। গ্রামের লোকদের নিয়ে বিনয় সেখানে দীঘি কাটছে। গাঁয়ের লোকেরা প্রথমে রাজি হতে চায়নি, আর কিছুতে নয়, শুধু তাদের এরকম সৌভাগ্য হতে পারে তারই অবিশ্বাসে। কিন্তু বিনয় তাদের সন্দেহ ভেঙে দিয়েছে নিজ হাতে খন্তা চালিয়ে। বলেছে, 'জমি দিলাম আমি, তোমরা শুধু একটু পরিশ্রম দিতে পারবে না? আমাদের টাকা নেই বটে, কিন্তু আমাদের তো আছে গায়ের জোর, একতার জোর। কোন্ কাজটা তবে আর আমাদের অসাধ্য?'

পাশ-দীঘ মেপে নিয়ে সবাই লেগে গিয়েছে তখন দীঘি কাটতে—ঘনশ্যাম আর তেজোবর, চিন্তারাম আর ফুলচাঁদ, হরিচরণ আর বৈষ্ণবদাস। মাথার উপরে প্রখর সূর্য, সর্বাঙ্গে মাটি—বিনয় লেগে গেছে জলের আবিষ্কারে, পিপাসার্তের দুঃখমোচনে। ওদের সে কথা দিয়েছিল, জল এনে দেবে সে তাদের ঘরের দুয়ারে, অপর্যাপ্ত অফুরন্ত জল,—সে-কথা সে এখন ফিরিয়ে নেবে কি করে? টাকা নেই, না থাক, কিন্তু অনন্য সঙ্কল্প তো আছে।

উপদেশের চেয়ে কাজ বড়ো—তাই বিনয় নিজে লেগে গেছে মাটি কোপাতে। কাউকে কিছু আর বলতে হয়নি।

কিন্তু পরদিন সকালে এসে দেখে একজনও কেউ আসেনি। ধারে-পারে যে কেউ নেই তাই শুধু নয়, কালকের-কাটা গর্ত-গুলো পর্যন্ত বুজিয়ে দেয়া হয়েছে। যে জায়গাটা কাল উৎসাহে ভীষণ সরগরম ছিল, আজকে তা একেবারে শোক-নীরব! এমন কেউ চোখে পড়ে না যে ব্যাপার কী জিজ্ঞাসা করে।

কাছেই তেজোবরের বাড়ি। বিনয় সোজা সেখানে গিয়ে হাজির হলো। দেখলো তার বাড়ির গলির ছায়ায় বসে তেজোবর তামাক সাজছে, কাছেই বসে ঘনশ্যাম আর চিন্তারাম। এমন একখানা তাদের ভাব যেন সকালবেলাটা তাদের আজকে গাফিলতি করেই কাটাতে হবে।

তাদের গুলতানি করতে দেখে বিনয় একেবারে ফেটে পড়লো: 'কী, তোমরা এখনো কাজে যাওনি যে? আমি এসে তাড়া না দিলে নিজেরা গিয়ে লাগতে পারো না? গরজটা কি আমার না তোমাদের?'

ওরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো, কারুরই মুখে কোনো কথা জুয়ালো না।

'কালকের গর্তগুলি সব কে বুজিয়ে দিয়ে গেছে দেখেছ?' বিনয় আবার ধমক দিয়ে উঠলো।

তেজোবরই সাহস করলো শেষ পর্যন্ত। বললে, 'দেখেছি। ও আমাদেরই কাজ। আমরাই বুজিয়ে দিয়েছি ঐ গর্তগুলো।'

'কেন?' বিশ্বাস করা বিনয়ের পক্ষে সহজ ছিল না।

'পুকুর আমরা চাই না। দরকার নেই আমাদের ভালো জলে।'

'তার অর্থ?' বিনয়ের কপালের শিরা দুটো দপদপ করতে লাগলো।

তেজোবর কী বলতে যাচ্ছিল, ঘনশ্যাম তাকে বাধা দিল। বললে, 'সোজা কথা স্পষ্ট করেই বলি বাবু। নায়েববাবু আমাদের পুকুর কাটাতে বারণ করে দিয়েছেন।'

'শুধু বারণ করে দেননি, খবর পেয়ে কাল রাত্রে লোকজন নিয়ে এসে জোর-জুলুম করে আমাদের দিয়ে গর্তগুলো বুজিয়ে দিয়েছেন।' বললে চিন্তারাম।

এমনি কিছু একটা বিনয় আশঙ্কা করছিলো। বললে, 'তোমরা শুনলে কেন তার কথা?'

'না শুনি এমন সাধ্য কী আমাদের?' ঘনশ্যাম বললে, 'তাঁরি আশ্রয়ে বাস করি, তাঁরি অবাধ্য হই কী করে? বললেন, না বোজাবি তো ঘর জ্বালিয়ে দেব, লাঠিপেটা করে গায়ের হাড় তোদের আস্ত রাখবো না। মরতে তো এমনিই বসেছি, তার আগে খামোখা জখম হতে যাই কেন?'

অসহিষ্ণু গলায় বিনয় বললে, 'তোমরা বললে না কেন হুকুম করবার তুমি কে? স্বয়ং জমিদারের ছেলে আমাদের কাটতে বলে গিয়েছে, লড়তে হয় তার সঙ্গে লড়ো গে যাও।'

'বলেছিলাম, কিন্তু তিনি বললেন, আপনি নাকি কেউ নন।'

'আমি কেউ নেই, আর উনি, মাইনেখোর কর্মচারী, উনিই হচ্ছেন সব! এমন বুদ্ধি না হলে তোমাদের এই দশা!' বিনয় টিটকিরি দিয়ে উঠলো।'

'উনি বলেন, 'পুকুর কাটতে হলে বড়োবাবুর মত লাগবে। তিনি বেঁচে থাকতে—'

'তাঁর সেই মত আছে কি নেই সে সম্বন্ধে কার কথাটা বেশি মূল্যবান্? আমার, তাঁর বড়ো ছেলের, না, তাঁর নায়েবের, আজ বাদে কাল যার চাকরি চলে যেতে পারে? আমি বলছি পুকুর কাটতে, সেইটেই বাবার যথেষ্ট অনুমতি, এর পর আর তাদের নায়েবের সমর্থনের প্রয়োজন হয় না। তোমরা থামলে কেন? বললে না কেন সোজাসুজি, বড়োবাবুর ছেলের আদেশের মাঝেই বড়োবাবুর নিজের অনুমতি রয়েছে।'

'আমরা সবই বলেছিলাম বাবু যদ্দূর যা বলবার।' চিন্তারাম চিন্তিত মুখে বললে, 'কিন্তু নায়েববাবু শেষকালে এক মোক্ষম কথা বলে গেলেন। বললেন, আপনার মত-অমতের কোনোই দাম নেই, কেননা—'

'কেননা আপনি বড়োবাবুর ছেলেই নাকি নন।' তেজোবর তেজের সঙ্গে বললে।

'আমি ছেলে নই, ছেলে ঐ তোমাদের ব্রজ-নায়েব? পঞ্চাশ বছরের ঐ ধুমসো?'

'না, ছেলে হচ্ছে তাঁর খোকাবাবু—মাধব—মাধববাবু।'

'আর আমি বানের জলে ভেসে এসেছি, না?' বিনয় বিরক্তিতে ঝাঁঝিয়ে উঠলো: 'তোমাদের ধোঁকা দেবার আর কোনো ও ফিকির পেল না? ছেলে হই বা না হই, নিজের আরব্ধ কাজ তো আগে শেষ করি, অন্তত মানুষের তো ছেলে।

তোমরা না আস সঙ্গে, একলাই আমাকে করতে হবে। দাও দেখি তোমাদের খন্তা-কোদাল, আমি একলাই মাটি কোপাবো।'

ঘনশ্যাম বললে, 'যন্ত্রপাতি সব নায়েববাবু আজ ধরে নিয়ে গেছেন।'

'কোথায় ?'

'হরিণবাড়ির কাচারিতে। তিনি সকালেই সেখানে এসেছেন শুনলাম। তাঁর দফাদারদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মাল ধরতে।'

পাশের গ্রামই হরিণবাড়ি, বেশি দূরের রাস্তা নয়। বিনয় একবার তাকালো গ্রামান্তের অভিমুখে। বললে, 'আমি এখুনি চললুম হরিণবাড়ি। আমার সঙ্গে আসবে কেউ তোমরা ? কেউ তোমরা দেখতে চাও স্বচক্ষে, আমার কথাটাই বড়ো না নায়েবের কথাটাই বড়ো ? আমারই না নায়েবের এই জমিদারি ?'

তিন জনই বিনয়ের সঙ্গ নিল, উদ্দেশ্যটা নিরপেক্ষ মজা দেখবার জন্যে।

হরিণবাড়ির কাচারিতে ব্রজ-নায়েব সমাগত প্রজাবৃন্দের কাছে তখন নানাজাতীয় সদুপদেশ বিতরণ করছিলেন, সঙ্গীসহ বিনয় এসে উপস্থিত হলো।

কিছু তার বলবার আগেই ব্রজলাল সরাসরি বলে উঠলেন, 'খাস-পতিত জমিতে পুকুর তুমি কাটতে পারো, কিন্তু সর্বাগ্রে তোমার মত নিতে হবে।'

'কার ? আপনার ?'

'না, না, আমার কেন? আমি কে? আমি তো মাত্র মাইনে-করা কর্মচারী।'

'হ্যাঁ, দয়া করে সেটা সর্বক্ষণ মনে রাখবেন।' বিনয় উদ্ধত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলে, 'আপনার নয়, তবে কার মত নিতে হবে? বাবার?'

কানের পিঠ চুলকে ব্রজলাল কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বললেন, 'তাই বা বলি কি করে? তিনি তো তাঁর সমস্ত মতামত আমার ওপরই ন্যস্ত করেছেন।'

'আপনারো না বাবারো না, তবে মত নিতে হবে কার?'

'এই জমিদারির যে ভবিষ্যৎ মালিক, তার। মাধবের।'

'মাধবের?' বিনয়ের গলাটা কেমন টলে গেল। 'এই জমিদারির সেই একমাত্র ভবিষ্যৎ মালিক নাকি? আর আমি?'

'তুমি কেউ নও।' ব্রজলালের গলা এতটুকুও কাঁপলো না; 'জমিদারের ছেলেই তুমি নও।'

'আপনার গায়ের জোরে নাকি?'

'আমার গায়ের জোরে হবে কেন? ভাগ্যের বিধানে। অনেক বছর পর্যন্ত জমিদার বিজয়নারায়ণের সন্তানাদি হয়নি বলে তোমাকে পোষ্য নিয়েছিলো—'

'এ কথা আমি জানি না, জানেন আপনি?' বিনয় প্রতিবাদ করে উঠলো।

'তুমি জানবে কি করে? তখন তুমি মোটে এক বছরের শিশু, যখন দত্তকপত্র হয়। তোমার মা—'

'আর আপনার এ-স্টেটে চাকরি কদ্দিন ?'

'বেশি দিন নয়, দশ বছর। হ্যাঁ, মানছি, আমার জ্ঞানটা প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ, কিন্তু প্রজাদের মধ্যে অনেকেই তা জানে—'

'হ্যাঁ, জানি বৈ কি। এ আর কে না জানে ? অঃ, কত উৎসব সেদিন জমিদার-বাড়িতে !' প্রজাদের মধ্যে যারা বৃদ্ধ ও বয়স্ক, সবাই একবাক্যে কথা কয়ে উঠলো।

বিনয় বুঝলো তার বিরুদ্ধে নতুন রকম একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলেছে।

'তাই, যদ্দিন একা ছিলে, একেশ্বর ছিলে,' ব্রজলাল নিষ্ঠুর, নির্লিপ্ত গলায় বলতে লাগলেন, 'ততদিন এই বিশাল জমিদারি একা তোমার বলে অনায়াসে ভাবা যেত। কিন্তু যেদিন মাধব এসে জন্মালো, সেই দিনই তোমার সমস্ত স্বত্ব, সমস্ত অধিকার লোপ পেয়ে গেল। সেইদিন থেকে তুমি একজন পথের মানুষ, মাটি-কাটা মজুর হয়ে গেলে।'

ব্রজলাল তাঁর চশমার ভিতর থেকে তীব্র চোখে বিনয়কে দেখতে লাগলেন।

'তুমি নিজে টের পাচ্ছ না মাধবের জন্মাবার আগে তোমার যে আধিপত্যটা ছিল সে আজ কোথায় ? বুঝতে পাচ্ছ না, কেন, কিসের জন্যে, তোমার সামান্য দুশোটা টাকার প্রার্থনা আমাকে নামঞ্জুর করতে হয়। কারণ, তুমি আর কেউ নও, এখন মাধবই হচ্ছে যুবরাজ। সুতরাং, তোমার রোজগার-পাতি না থাকে, সামান্য মাটি-কাটার মজুরি খেটে পয়সা কামাতে

চাও, তবে স্বয়ং মাধববাবুর মত আনতে হবে ; তাঁর মত ছাড়া তাঁর খাস-পতিত জমিতে গর্ত করা দূরে থাক, একগাছি ঘাসও তার তুমি তুলতে পারবে না।'

যদিও বুকের ভিতরটা তার হিম হয়ে এসেছিল, বিনয় মুখে অবিশ্বাসের ভাব ফুটিয়ে রেখে বললে, 'আমার সম্বন্ধে এই অমূল্য আবিষ্কারটা আপনি করলেন কবে ?'

'বহু আগে। প্রথমত শুনে, দ্বিতীয়ত স্বচক্ষে দলিল দেখে। উদ্‌ঘাটন করলুম শুধু আজ। এতদিন তার দরকার হয়নি। যেহেতু সম্প্রতিই তুমি দিনে-দিনে হয়কে নয় মনে করে মাত্রা ছাড়িয়ে চলেছ—'

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলো বিনয়। বললে, 'মাত্রা ছাড়ানোর আপনি দেখেছেন কী ? বেশ, আপনি বসুন, আমি এখুনি মাধবের, মাধববাবুর মত নিয়ে আসছি।' বলে বিনয় দ্রুত পায়ে গ্রামের রাস্তা দিয়ে চলতে সুরু করলো।

ব্রজলাল তার পিছনে দুজন গুপ্তচর লাগিয়ে দিলেন।

গ্রাম থেকে গ্রাম পেরিয়ে দীর্ঘ রাস্তা অতিক্রম করে বিনয় যখন বাড়ী পৌঁছুলো তখন বেলা প্রায় দুপুর ছাড়িয়ে গেছে। সোজা সে অন্দর-মহলে চলে গেল, তার মার ঘরে। দেখলো সুনয়নী একটা টুলের উপর বসে আছেন আর দাসী তাঁর খোলা চুলে তেল মাখিয়ে দিচ্ছে।

বিনয় সরাসরি ব্যাকুল কণ্ঠে জিগগেস করলো : 'মা, সত্যি করে বলো, তুমি আমার মা নও ?'

উত্তর দেবার আগে সুনয়নী ব্যাকুল চোখে দেখে নিলেন মাধব কোথায়। দেখলেন, খাওয়া-দাওয়ার পর মাধব স্নিগ্ধ, সুস্থ দেহে খাটের উপর ঠিকই ঘুমোচ্ছে, খাটের পায়ার কাছে বসে চাকর ঠিকই আছে পাহারায়। কাল যে ভয়ঙ্কর বিপদের মাঝখানে মাধবকে বিনয় নিয়ে গিয়েছিল, তারপর তার প্রতি তাঁর মনে আর এতটুকুও আর্দ্রতা নেই, থাকতে পারে না।

'না।' নিষ্কম্প গলায় সুনয়নী উত্তর দিলেন।

বিনয় ভাবলো মার এটা অভিমানের স্বর, তাই অনুনয়ের সুরে বললে, 'তুমি যদি আমার মা নও, কে তবে আমার মা?'

'কে আবার! ঐ বুড়ি জগঠাকরুন—জগমোহিনী।'

বিনয় ভাবলো, এটাও মার ঠাট্টা। বললে, 'কেউ গোপাল বলে ডাকলেই কি সে গোপালের যশোদা হয়ে গেল, মা? আমার এমন সুন্দর মা থাকতে অমন বুড়ি আমার মা হবে কেন?'

'যা হয়ে গেছে তা আর বদলানো যাবে কি করে? আমি সুন্দর মা শুধু মাধবের। তুমি যদি আমার ছেলে হতে তবে তোমার চেহারা তো সুন্দর হতোই, স্বভাবটাও ভালো হতো।'

বিনয় পাথরের মতো অচল হয়ে রইলো, কেননা সুনয়নীর এইবারের কথার স্বরটাতে রাগ বা ঠাট্টা নেই, দস্তুরমতো ঘৃণা রয়েছে পুঞ্জীভূত হয়ে। সামনে জানলার একটা শিক ধরে বিনয় দৃঢ় হয়ে দাঁড়ালো। বললে, 'আমি এ কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা, মা।'

'কিন্তু বুঝতে তো একদিন হবেই। চিরকাল তো চোখে ধুলো দিয়ে থাকা যাবে না।' বলে সুনয়নী উঠে পড়লেন।

স্নানের সরঞ্জাম নিয়ে দাসী বাথরুমে চলে গেল। সুনয়নী দরজার দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে বললেন, 'আগাগোড়া ভালো করে যদি বুঝতে চাও, তবে ওঁকে গিয়ে সব জিগগেস করো।'

দরজার কাছে গিয়ে বিনয় সুনয়নীকে বাধা দিল। বললে, 'বাবা কেন, তুমিই তো যথার্থ বলতে পারবে তুমি আমার সত্যিকারের মা কিনা।'

'হ্যাঁ, আমিই বলছি, নই আমি তোমার মা।' সুনয়নী এমন ভঙ্গিতে কথাটা বললেন, বিনয় অনুভব করলে, তাতে সত্যি-সত্যিই মাতৃস্নেহের এতটুকু কোমলতা নেই।

জিভ দিয়ে বিনয় একবার তার ঠোঁট দুটো লেহন করলো। বললে, 'তবে এখানে আমি এলুম কি করে?'

'তোমাকে পোষ্য নেয়া হয়েছিল বলে।'

'পোষ্য?' বিনয় দরজাটা শক্ত করে চেপে ধরলো।

'হ্যাঁ, তাই। বিশ্বাস না করো, নায়েববাবুর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে দত্তকপত্রটা পড়ে দেখতে পারো।'

'কার ছেলে পোষ্য নিয়েছিলে?'

'বলেছি তো, জগমোহিনীর।' সুনয়নী একটা জ্বলন্ত কটাক্ষ করলেন। 'যে এখন প্রতিশোধ নেবার জন্যে আমার মাধবের দিকে হাত বাড়িয়েছে।'

'প্রতিশোধ কিসের ?'

'তার বাড়া ভাতে যে এখন ছাই পড়েছে। মাধব যে তার পথের কাঁটা।'

শুকনো গলায় বিনয় ঢোক গিললো। বললে, 'সব কথা আমাকে দয়া করে একটু খুলে বলবে, মা ?'

অতি-উৎসাহে বিস্তৃত আকারে সুনয়নী যা বললেন, সংক্ষেপে তা এই ঃ

জগমোহিনী বিজয়নারায়ণের মাসতুতো দাদা গঙ্গাচরণের স্ত্রী। গঙ্গাচরণ ভীষণ দরিদ্র ছিলেন, প্রায়ই দু' বেলা আহার জোটাতে পারতেন না। তিনি যখন মারা যান, তিনটি নাবালক ছেলে নিয়ে জগমোহিনী অকূলে পড়লেন—বড়োটির বয়স তখন বারো, ছোটটির বয়স এক—আর এই ছোটটিই হচ্ছে বিনয়। সে আজ প্রায় আঠারো-উনিশ বছর আগেকার কথা।

এদিকে বিজয়নারায়ণের প্রথম পক্ষের স্ত্রী যখন নিঃসন্তান মারা গেলেন আর দ্বিতীয় পক্ষের আমলেও যখন বছর পাঁচেকের মধ্যে ঘরে ছেলে এলো না, তখন বিজয়নারায়ণ ঠিক করলেন পোষ্য নেবেন। জগমোহিনী তখন অভাবের তাড়নায় মৃত্যুর মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, সে তার কনিষ্ঠ ছেলেটিকে উপহার দেবার জন্যে আবেদন জানালো।

'তাতে তার লাভ ?' বিনয় হঠাৎ বেখাপ্পা প্রশ্ন করলে।

'একসঙ্গে কিছু টাকা পাবার জন্যে।'

'তাঁর বুকের থেকে ছেলে কেড়ে না নিয়েও তো কিছু টাকা

তাঁকে দেয়া যেত—তাঁর যখন অমন অভাব, আর তিনি যখন তোমাদের আত্মীয়া।' বিনয়ের চোখ দুটো জ্বালা করে উঠলো।

সুনয়নী নিষ্ঠুরের মতো হাসলেন। বললেন, 'যেখানে স্বার্থ নেই, সেখানে উনি এক পয়সা ব্যয় করেন না।' পরে আবার তিনি কাহিনীর পৃষ্ঠা উলটোলেন :

জগমোহিনীর ছোট ছেলেটির তখন মৃতকল্প অবস্থা, মুখে তার এক ফোঁটা দুধ দেবার শক্তি নেই তাঁর। শুধু যে দয়াপরবশ হয়েই বিজয়নারায়ণ বিনয়কে গ্রহণ করেছিলেন তা নয়, ললাটলিখন ও করকোষ্ঠি বিচার করে কুল-জ্যোতিষীরা একবাক্যে বললে, এ ছেলে অত্যন্ত সুলক্ষণ ছেলে, অনন্যসাধারণ ছেলে, ভবিষ্যতে এ দেশপূজ্য হবে, দিগ্বিজয়ী হবে।

বিনয়ের মুখে একসঙ্গে দৃঢ়তা ও দীপ্তি ফুটে উঠলো। বললে, 'তারপর তোমরা নিলে সেই ছেলেকে?'

প্রকাণ্ড ধূমধাম করে হোম-যজ্ঞ করে পোষ্য নেয়া হলো। এককালীন কিছু মোটা টাকা নিয়ে জগমোহিনী কাশী চলে গেলেন—একের বিনিময়ে বাকি দু' জনকে তিনি একটু আরামে রাখবেন এই ভরসায়। আর সেই এক, মানে বিনয়ের তো আরামের অবধিই রইলো না। কাশী গিয়ে চুপচাপ রইলেন উনি অনেকদিন। মেজ ছেলেটি যখন ওঁর মারা গেল তখনো বড়টিকে তিনি আঁকড়ে রইলেন; কিন্তু বছর চারেক আগে বড়টিও যখন চলে গেল তখন উনি প্রায় পাগলের মতো হয়ে গেলেন। কিসের আকর্ষণে চলে এলেন মোহনপুর; আর একদিন

রাত্রে, বিনয় যখন রোগশয্যায় প্রায় মৃত্যুর দুয়ারে, সেই পাগলিনী হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে-কয়ে সোজা উপরে বিনয়ের ঘরে চলে আসেন আর শিয়রে বসে বিনয়ের মাথাটা তাঁর কোলের মধ্যে টেনে নেন। আর, বাড়ির সবাই যখন কাঁদছে, সেই পাগলী রোগীর গায়ে-মাথায় হাত বুলুতে-বুলুতে অদ্ভুত হেসে ওঠে এই বলে : 'আর ভয় কী তোমাদের ! আমি এসে পড়েছি। খোকাকে আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।'

'এ বাড়ির খোকা আর তখন তুমি নও।' সুনয়নীর মুখে-চোখে একটা কেমন ভয়ের ভাব ফুটে উঠলো, মুখ বাড়িয়ে দেখে নিলেন মাধব খাটে ঠিক শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে কিনা, বললেন, 'এ বাড়ির খোকা তখন মাধব, এক বছরের। আমরা সবাই চিনতে পেরেছিলুম পাগলীকে যদিও তার তখন উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা, পরনের কাপড়-চোপড়গুলো অত্যন্ত জীর্ণ। কেউ তাকে তখন কিছু বললো না বটে, কিন্তু আমার ইচ্ছে হচ্ছিল তাকে তাড়িয়ে দিই। আমার কেবলি ভয় হচ্ছিল আমার মাধবকে সে ছিনিয়ে নিতে এসেছে। মাধবকে বুকের মধ্যে প্রাণপণে আঁকড়ে বসে আছি, উন্মাদিনীর সঙ্গে হঠাৎ আমার চোখোচোখি হয়ে গেল। সে কী ভয়ঙ্কর ক্ষুধার্ত চাহনি !

সেইদিনই জগমোহিনী জানতে পেলেন বিনয়ের পথ আর নিষ্কণ্টক নেই।'

'তারপর ?' বিনয় জিগগেস করলো।

'তারপর তুমি সে-রাত্রে ভালোর দিকে মোড় ফেরবার পর

সকাল না হতেই দিদি কোথায় অন্তর্ধান করলে। সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম। কিন্তু তারপর থেকে-থেকেই তাকে মোহন-পুরে দেখা যেতে লাগলো, বিশেষত ছুটির সময়, যখন তুমি বাড়িতে। ঘুরঘুর করতো রাস্তায়, দাঁড়িয়ে থাকতো গেটের কাছে, কখনো বা অত্যন্ত সাহস করে কাছারি-বাড়িতে ঢুকে পড়তো। কাকে চাই জিগগেস করলে বলতো, খোকাকে চাই। সে হয়তো তোমাকেই চাইতো, কিন্তু এ-বাড়ির খোকা বলতে এখন মাধব, তাই ভয়ে আমি শিউরে উঠতুম।'

'আমাকে একবার দিয়ে ফেলে আবার আমাকে ফিরে চাইবে কেন?' বিময় হঠাৎ কর্কশ গলায় প্রশ্ন করলো।

'চায় মানে দেখতে চায়, কাছে রাখতে চায়, সাহায্য পেতে চায়। দু'-দু' ছেলে ছেড়ে চলে গেছে, তাই ছোট ছেলের জন্যে টান হওয়াটা স্বাভাবিক, তায় এমন বড়লোক ছেলে! কিন্তু ওটা শুধু তার একটা ছল, তার আসল উদ্দেশ্য এখন দেখছি তুমি নও, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মাধব।' সুনয়নীর চোখে একটা হিংস্রতা ফুটে উঠলো: 'সে তার খোকাকে চায় না, চায় আমার খোকাকে, আর তা তার নিজের খোকার জন্যে।'

'তার মানে?'

দাঁতে দাঁত ঘসে সুনয়নী বললেন, 'কাঁটা গাছ সে উপড়ে তুলে ফেলতে চায়। তারি জন্যে কাল সে মাধবকে তার বাড়িতে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল।'

'বাজে কথা। সমস্তটাই তোমার বাজে কথা, মা।' মুখে

হঠাৎ সরল সরসতা এনে বিনয় বললে, 'তুমি কি আমার মা না হয়ে পারো ?' বলে সে মাকে ধরতে গেল।

সুনয়নী পিছনে সরে গিয়ে বললেন, 'আমাকে যদি বিশ্বাস না হয়, ওঁকে তবে জিগগেস করো গে।'

বিনয় নিজেকে গুটিয়ে নিল। কিছু আর না বলে দৃঢ় পায়ে সোজা চলে গেল সে বিজয়নারায়ণের ঘরে। বাথরুমে ঢোকবার আগে পাহারা থাকা সত্ত্বেও মাধবের ঘরের দরজাগুলি সুনয়নী বন্ধ করিয়ে নিলেন।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর বিজয়নারায়ণ ইজি-চেয়ারে শুয়ে তাঁর সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্রের উপর ঢুলছেন, বিনয় দরজার কাছে এসে গম্ভীর গলায় বললে, 'বাবা, আপনাকে আমি একটা কথা জিগগেস করতে চাই।'

বিজয়নারায়ণ চমকে উঠলেন। নানারূপ অভিযোগ-অশান্তি তাঁকে এখন একেবারে বিরক্তির শেষ সীমায় নিয়ে এসেছে; তাই তিনি আজ ঠিক করেছিলেন সেই সব অভিযোগ-অশান্তির মূল, বিনয়কে, তিনি সত্যিকার অবস্থাটা সম্বন্ধে সচেতন করে দেবেন। সে যে মাধবের সমান নয়, মাধবের চেয়ে নীচু, এই দিব্যজ্ঞান না হলে, তিনি বুঝেছিলেন, তার আস্ফালন থামবে না। একদিন যখন তাকে জানতেই হবে তখন আর দেরি করে লাভ নেই, বরং ক্ষতির সম্ভাবনা।

বিজয়নারায়ণ বললেন, 'জিগগেস করবার কিছু দরকার নেই। যা শুনেছ সব সত্যি।'

'কী সত্যি ?' বিনয় অবাক হবার চেষ্টা করলো।

'তুমি শোননি তোমার মার কাছে, মানে, মাধবের মার কাছে ?'

বিনয়ের বুকের মধ্যে একটা ঘা পড়লো। বললে, 'শুনেছি। কিন্তু সত্যি-সত্যিই কি মাধবের মা আমার মা নন ?'

'না। নন।' বিজয়নারায়ণের স্বর অত্যন্ত স্পস্ট।

'তবে সেই জগ—জগমোহিনী আমার মা ?'

'মার নাম উচ্চারণ করতে হয় না।' বিজয়নারায়ণ ধমক দিয়ে উঠলেন।

'বোধহয় হয় না। কিন্তু তেমন মা হলে একশোবার করা উচিত। নাম শুধু উচ্চারণ নয়, নাম কীর্তন করা উচিত।' বিনয় অসহিষ্ণুর মত বললে, 'আমি আপনার মুখে স্পষ্ট করে শুনতে চাই, তিনিই কি আমার মা ?'

'হ্যাঁ, তিনি। নায়েববাবুর কাছে চাইলেই তুমি আসল দত্তকপত্রখানা দেখতে পাবে। যা সত্য, তা জেনে ও জানতে দিয়ে উভয়পক্ষই আমরা নিশ্চিন্ত হলুম। আশা করি, এবার তুমি তোমার অবস্থাটা বুঝে একটু চুপচাপ থাকবে, একটু সামলে চলবে চারদিক।' বিজয়নারায়ণ গড়গড়ার স্খলিত নলটা তুলে নিলেন।

দ্রুত পায়ে বিনয় আবার স্নুনয়নীর ঘরের দিকে ফিরে এল। দেখলো দরজা কখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ডাকলো : 'মা।'

কেউ সাড়া দিল না।

'আচ্ছা, বেশ, আমি চললুম—'

কারুরই আর কোনো ব্যাকুলতা নেই।

সাত

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেই চড়া রোদে বিনয় সোজা এসে হাজির হলো, আর কোথাও নয়, হরি গাঙ্গুলির বাড়িতে। হরি পণ্ডিত তখন বাইরের দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে দিবানিদ্রার উদ্যোগ করছেন। কিছুটা দূর থেকেই বিনয় উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো: 'আপনার পিসিমা কোথায়?'

প্রশ্নটা যেন কিছুই বুঝতে পারেনি হরি পণ্ডিত এমনি এক-খানা সরল মুখ করে রইলো।

বিনয় কাছে এসে বললে, 'আপনার পিসিমাকে একবার ডেকে দিন।'

'পিসিমা!' হরিপণ্ডিত ডাঙায়-তোলা মাছের মত চেয়ে রইলো, বললে, 'সে তো আজ চলে গেছে।'

'চলে গেছে না তাকে আপনি তাড়িয়ে দিয়েছেন?'

'তাড়িয়ে না দিয়ে কী আর করি বলো? দূর সম্পর্কের কে-না-কে-এক পিসির জন্যে কে তার রোজগারের পথটা মাটি করে দেয়?' হরিপণ্ডিত ভয়-কাতর মুখে বললে, 'ধর্মই বলো আর পরকালই বলো, তোমাদের নায়েববাবুর লাঠির কাছে কিছুই নয়।'

'কোথায় গেছেন তিনি বলতে পারেন?'

'কী করে বলবো, কোথায় গেছে! বললুম তো এই গ্রাম থেকেই চলে যেতে।'

'যাবার রেল-ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন?' বিনয়ের গলায় বিদ্রূপ মেশানো।

'রেল-ভাড়া দেবার ক্ষমতা কোথায়? নিজেরই দিন চলে না। ভিক্ষে-টিক্ষে করে জোগাড় করে নেবে নিশ্চয়। কিন্তু তাকে তোমার এত খোঁজ কেন বলতে পারো?' হরিপণ্ডিত জিজ্ঞাসু চোখে চাইল: 'কী দরকার তার কাছে?'

'দরকার—ভীষণ দরকার।' বিনয় ম্লানমুখে হাসলো: 'কী দরকার বললে বলে দিতে পারবেন কোথায় আপনার পিসিমা?'

'কী করে বলবো? আমি আর তার কোনোই খোঁজ রাখি না।'

মুহূর্তে বিনয়ের কাছে সমস্ত আলো যেন অন্ধকার হয়ে গেল! কোথায় সে যাবে, কার কাছে গিয়ে সে দাঁড়াবে, কিছুরই সে কোনো দিশে পেল না।

তার এই গ্রাম, নরম স্নেহময় মাটি, গ্রীষ্মকালে ঘন সবুজ ঘাসের উচ্ছ্বাস, এই তার অনেক বড় উন্মুক্ত আকাশ, বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো পাখার ভিতরকার অদেখা রঙ ফুটিয়ে পাখিদের হঠাৎ উড়ে যাওয়া, এই সব ডাল-পালা-মেলা বড়-বড় গাছ, গাছের তলাকার ছায়া, দূরে তার ঐ সোনালী নদী, ওপারে বিস্তীর্ণ চর ভরে ধানের ক্ষেত—সব, সমস্ত কেমন যেন তাকে কান্নার সুরে বলে উঠলো, বিদায় বিদায়! যেন এরা আর তার কেউ নয়, যেন সবারই সে অচেনা, সবারই সে দূর। সমস্ত প্রকৃতি আজ বোবা, বধির।

কোথায় সে যাবে জানে না, শুধু চলে যাবে চক্ষু যেখানে যায়, চক্ষু যেখানে ঘুমে বুজে আসে।

কখন যে এরি মধ্যে নীল আকাশ কালো হয়ে উঠেছে বিনয় টের পায়নি। হঠাৎ এলোমেলো ঠাণ্ডা হাওয়া বইতেই তার জ্ঞান হলো; চেয়ে দেখলো আকাশে ঝড়ের আড়ম্বর উঠেছে সঞ্চিত হয়ে। দেখতে না দেখতেই দিঙ্মণ্ডল কাঁপিয়ে ঝড়ের তাণ্ডব সুরু হয়ে গেল, সঙ্গে-সঙ্গে সশব্দ শিলাবৃষ্টি। আশ্রয় নেবার জন্যে বিনয় তাড়াতাড়ি সামনে কার এক একচালার দাওয়ায় উঠে দাঁড়ালো।

বাঁশের একটা খুঁটি ধরে দেখতে লাগলো সে ঝড়, মাটির সবুজের উপর আকাশের শুভ্র পুষ্পবৃষ্টি—দেখতে লাগলো সে নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে, নিরপেক্ষ নিরুৎসাহের মত। জলের ছাঁটে গা তার ভিজে যাচ্ছে বটে, কিন্তু বন্ধ দরজায় করাঘাত করতে প্রবৃত্তি হয় না—যেটুকু স্থান সে পেয়েছে, এই তার যথেষ্ট।

অজস্র শিল পড়ছে অথচ সে একটাও কুড়াচ্ছে না, এ যে কেমন করে আজ সম্ভব হলো বিনয় ভেবে পেলো না।

সশব্দে দরজা গেল খুলে। ভিতর থেকে কে মুখ বাড়িয়ে বললে, 'দাঁড়িয়ে কে ওখানে?'

বিনয় মুখ ফেরালো।

'ও মা, এ যে রাজপুত্তুর!'

'কে, আমার গোপাল?' ঘরের ভিতর থেকে আরেক জন কে ছুটে এল ব্যাকুল হয়ে।

বিনয় চেয়ে দেখলো, আর কেউ নয়, জগমোহিনী। ঝড়ের আগেকার স্তম্ভিত আকাশের মতো রুদ্ধনিশ্বাসে সে দাঁড়িয়ে রইলো।

বিনয়ের মনের মধ্যে কি একটা তোলপাড় চলেছে একদৃষ্টে বুঝে নিয়েছে জগমোহিনী। এক পা এগিয়ে এসে তিনি বললেন, 'কী হয়েছে তোর গোপাল?'

'আমার নাম গোপাল নয়।' বিনয় ধমকে উঠলো।

'কিন্তু জননীর কাছে সব সন্তানই গোপাল, বাবা।' জগমোহিনী অদ্ভুত করে হাসলেন।

'জননীর কাছে! কিন্তু তুমি তো জননী নও, তুমি রাক্ষসী।'

নিষ্পলক চোখে জগমোহিনী বিনয়ের চোখের দিকে চেয়ে রইলেন। তাকিয়ে থাকতে-থাকতে দু' চোখ ছাপিয়ে তাঁর অশ্রুর বান ডেকে এল, এবং দু' চোখে পরিপূর্ণ জল নিয়েই তিনি ভাঙা গলায় হেসে উঠলেন—হাসিটা শোনালো ঠিক হাহাকারের মতো। বললেন, 'কী করে জানলি তা তুই?'

'ওরা আজ আমাকে সব বলে দিয়েছে।'

'বলে দিয়েছে! বলে তো তা একদিন দেবেই। দু' দুটো ছেলে আমি খেয়েছি, রাক্ষসী তো আমি বটেই। ওরা তো তাই আমাকে বলবে!' জগমোহিনী কান্নার আবেগে কাঁদতে লাগলেন।

'তার জন্যে নয়। মৃত্যুর ওপরে মানুষের হাত কী? অকালে

তোমার ছেলে মারা গেছে বলে তুমি রাক্ষসী নও, তুমি রাক্ষসী পেটের ছেলেকে তুমি পরের হাতে বিলিয়ে দিয়েছিলে বলে।'

'কিন্তু কেন বিলিয়ে দিয়েছিলুম তা তুই জানিস ?'

'জানি, তোমার নিজের পেট ভরাবার জন্যে।'

'নিজের পেট !' জগমোহিনী বিকটভাবে হেসে উঠলেন। বললেন, 'তখন তুই এক বছরের শিশু, কী জানবি তুই সেই দুর্দিনের ইতিহাস ! কারুর রান্নাঘরের নর্দমার মুখে হাঁড়ি পেতে ফ্যান সংগ্রহ করে বড় ছেলেদুটোর মুখে ঢেলে দিচ্ছি, দুধের বদলে তোকেও খাওয়াচ্ছি সেই ফ্যান। তার ওপরে তোর হলো জ্বর আর তড়কা—সে দুর্দিনের কথা আর মনে করিয়ে দিস না—সবাই তখন একসঙ্গে মরতে বসেছি।'

'তাই আমার বিনিময়ে নিজেরা সবাই বাঁচলে। তোমাদের সঙ্গে একত্র মরলে পরকালের নৌকোটা কি বেশি বোঝাই হতো ? এক বছরের একটা শিশু কি খুবই ভারি ?'

'তুই মরবি কেন ? বালাই, ষাট। তুই যে রাজা হবি। তোকে যে রাজা বানিয়ে দিলুম।' জগমোহিনী বিনয়ের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে হাত বাড়ালেন।

বিনয় সরিয়ে নিল নিজেকে। বাঁকা গলায় বললে, 'রাজা ! কে চেয়েছিল এই রাজত্ব ? তার চেয়ে তোমাদের সবাইর সঙ্গে আমার সমান দুঃখ ভাগ করে নেয়াও সুখের ছিল। যদি মরতুম, মার কোলে শুয়ে মরতুম। কিন্তু এ কী, এ আমার তুমি কী করেছ ?'

'কী করেছি ?'

'পথের ভিখারী করেছ। হয়ত তার চেয়েও নীচে ঠেলে দিয়েছ আমায়।'

'আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না, খোকা।' জগমোহিনী চেঁচিয়ে উঠলেন।

'বুঝতে পারবার কথা নয় তোমার। মাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজনটাই তুমি বোঝবার জন্যে নিজের দুগ্ধপোষ্য শিশুকে পর্যন্ত তুমি পর করে দিতে পারো। টাকা-পয়সার ওপারে আর কিছুই কোনো দিন দেখতে শেখনি। ছেলেকে ঐশ্বর্যের মাঝে ফেলে রেখে গেলে, ভাবলে ছেলের সুখের আর শেষ রইলো না!'

'কেন, তুই কি সুখী হসনি খোকা ? এত বড় বিশাল সম্পত্তি—'

'না, হইনি সুখী, হতে পারে না কেউ সুখী। ও-সব সুখ-ঐশ্বর্য আমার জন্যে নয়, আমি তা অনেক পিছনে ছেড়ে দিয়ে এসেছি।'

'কেন ?'

'সমস্ত মিথ্যা। সমস্ত মিথ্যা বলে। আমি এত মিথ্যার বোঝা আর বইতে পারছি না।' বিনয়ের চোখ ছলছল করে উঠলো : 'যাকে এতদিন মা বলে ডেকেছি সে আমার নয়, যাকে বাবা বলে জানতুম সে বাবা নয়, সব চেয়ে অসহ্য, মাধব আমার সহোদর ভাই নয়। ঐ বাড়ি-ঘর ক্ষেত-খামার মাঠ-নদী কিছুই আমার নয়। আমি পর, আমি বিদেশী, আমি কেউ নই কারুর।

এখন সমস্ত কিছু মাধবের। আমি অনায়াসে ভাবতে পারি, আমি চিরদরিদ্র, আমার সমস্ত কিছু আমার মাধবকে দিয়ে এসেছি।'

'কেন, কেন তুই তাকে দিয়ে আসবি ?'

'তাতে বুঝি হিংসায় তোমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে, না ? মাধব কিছু পায় এইটেই তোমার অসহ্য ! তোমার বোধহয় ধারণা মা বলে পরিচয় দিয়ে পরিত্যক্ত ছেলের কাছ থেকে কিছু দয়া চেয়ে নেবে শেষ বয়সে ? একবার বেচে পয়সা নিয়েছিলে, এবার যেচে যতটা পাও। নইলে এত বারণ করা সত্বেও তুমি এখানে আস কেন বারে-বারে ?'

'আসি কেন ?' জগমোহিনী দুই চোখে কাতরতা ভরে বললেন, 'আসি তোকে শুধু একটু দেখতে। হরি যখন আজ সকালে আমাকে তার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল তখনো সোজা রেল-ইস্টিশনের দিকে চলে যেতে পারলুম না। পথে এই জানকী বোস্টমীর বাড়িতে আশ্রয় নিলুম। অস্পষ্ট একটু আশা—যদি আবার তোর দেখা পাই !'

'তবে দেখ, এই আমার কলঙ্কিত মুখ, এই আমার নিরানন্দ নিরাশ্রয় মূর্তি, চক্ষু সার্থক করো।' বলে বিনয় এক পা এগিয়ে এলো।

জগমোহিনী চোখ বুজলেন। চোখ মেলে বললেন, 'চোখের তবুও তৃপ্তি হয় না, খোকা। দুঃখে থাক, সুখে থাক, তোকে দেখবার কামনা আমার হয়তো ঈশ্বরকে দেখার কামনার চেয়েও বেশি। ঈশ্বর তোর আশ্রয় কেড়ে নিয়ে থাকেন, তোর

আশ্রয় আছে তোর মার কোলে, মার আঁচলে। তুই আয়, খোকা।' জগমোহিনী হাত বাড়িয়ে দিলেন।

বিনয় আবার পিছু সরে গেল। বললে, 'এক বছরের শিশুকে যখন পরের হাতে বিলিয়ে দিয়েছিলে তখন এই কোল আর আঁচল কোথায় ছিল? একদিন ক্ষুধার তাড়নায় দূর করে দিয়েছিলে, এখন আবার সেই ক্ষুধার তাড়নায়ই ডাকাডাকি করছ। কিন্তু আমার ভিতরটা সব পাথর হয়ে গেছে, কোনো দাগই তাতে পড়ছে না।'

'না পড়ুক, ডাকবো না আমি। তুই শুধু আমাকে একবার ডাক। কতদিন শুনিনি সে-ডাক, কোনো দিন শুনিনি তা তোর মুখে।'

কথাটা বোধহয় বিনয় বুঝলো না। বললে, 'আমার এখনকার ডাক অনেক দুর্গম দূরে, দুঃসহ দুঃখের মধ্যে। মার কোল, মার আঁচল আর আমার দরকার নেই।' বলে বিনয় রাস্তায় নেমে পড়লো।

'শোন, শোন খোকা।' জগমোহিনী আর্তকণ্ঠে কাকুতি করে উঠলেন: 'সারাদিনে তোর কিছু এখনো খাওয়া হয়নি। আয় তুই আমার কাছে। আয়, তোকে দুটো ফুটিয়ে দি। খিদেয় তোর মুখ-চোখ কেমন শুকিয়ে গেছে!'

'তার জন্যে তোমার ভাবনা নেই।' বিনয় ফিরলো। বললে, 'আমার সঙ্গে ছেলে-মেয়ে বা ভাই-বোন নেই যে বিক্রি করে নিজের খিদে মেটাবো। যদি খেটে খেতে পাই খাবো,

না-পাই না-খেয়ে মরে যাবো! তবু আমি একা, আমার জন্য কারুর ভাবনা নেই পৃথিবীতে। যদি থাকতো তবে পেটে ধরে তা পরের হাতে বিলিয়ে দিত না।' বিনয় পিছনে না তাকিয়ে সোজা এগিয়ে চললো।

বৃষ্টির ধারা তখন সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। জগমোহিনীও রাস্তায় নেমে বিনয়ের পিছু নিলেন। চেঁচিয়ে উঠলেন: 'না, তুই একা নোস। আমি, আমি আছি তোর। ফিরে আয় তুই আমার কাছে।'

'অসম্ভব। তুমি আমার কেউ নও।'

'আমি তোর মা, সত্যিকারের মা। ফিরে না আসিস, একবার শুধু আমার দিকে ফিরে তাকা, খোকা। দিবানিশি যে-ডাক শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে আছি, সেই ডাকে একবারটি আমাকে ডাক।' জগমোহিনী বিনয়কে প্রায় ধরে ফেললেন: 'বল, মা, একবার আমাকে মা বলে ডাক, খোকা।'

বিনয় থামলো।

ডাক শোনবার আশায় জগমোহিনীও থামলেন।

বিনয় তাঁর কাছে এসে স্পষ্ট, একটু বা কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলো: 'জেঠিমা!'

'তখন তুই এক বছরের শিশু, কী জানবি তুই সেই দুর্দিনের ইতিহাস !...

—১৬ পৃষ্ঠা

আট

কোথায় চলেছে কিছুই বিনয়ের খেয়াল নেই, হঠাৎ একজন লোক পাশে এসে বিনীত ভঙ্গিতে বললে, 'বাবু আপনার জন্যে পালকি পাঠিয়ে দিলেন।'

'কে বাবু?' বিনয় লোকটার মুখের দিকে অপলক চেয়ে রইলো, কোথাও কোনো দিন দেখেছে বলে মনে করতে পারলো না।

'সাড়ে সাত-আনির বাবু। শোভনডাঙার দিগিন্দ্র সান্যাল। সোনালি পেরিয়েই শোভনডাঙা।' আগন্তুক নদীর অভিমুখে ইসারা করলো।

'আমি নাম শুনেছি দিগিন্দ্রবাবুর। বাবার, মানে বিজয়-নারায়ণ মৈত্রের সঙ্গে সরিকান সম্পত্তি নিয়ে অনেক তাঁর মামলা চলে শুনেছি। কোনো দিন দেখিনি ভদ্রলোককে।'

'তিনি আপনাকে নমস্কার জানিয়েছেন। পালকি নিয়ে বেয়ারারা ওপারে আছে।'

'আপনি কে?'

'আমি তাঁর নায়েব, আমার নাম শ্রীঅনাথনাথ বাগচী।' বিনয়ে বিগলিত হয়ে ভদ্রলোক বললে।

নায়েব বলতে যে একটা ঔদ্ধত্য-কাঠিন্যের ছবি তার মনে ছিল, বিনয় দেখলো তার সঙ্গে অনাথনাথের কোনো মিল নেই।

তিনি একজন দাসানুদাস, প্রভুর অনুগ্রহে-আশ্রয়ে খুবই আপ্যায়িত সর্বদা এমনি একটা গদ্গদ ভাব করে রয়েছেন। লোকটিকে বিনয়ের ভালো লাগলো, মনে হলো শিষ্টতার অভিনয় একটু বেশি করলেও এই হওয়া উচিত নায়েবের চেহারা।

কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বললে, 'কিন্তু আমাকে তিনি ডাকছেন কেন?'

'তা অনুমান করতে পারি এমন আমাদের শক্তি নেই, শক্তি থাকলেও উচ্চারণ করতে পারি এমন আমাদের সাহস নেই।'

'জিজ্ঞাসা করেন নি?'

'সর্বনাশ! তাঁর আদেশ নির্বিবাদে পালন করাই আমাদের কাজ, সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন বা কৌতূহল প্রকাশ করাটা ধৃষ্টতা। সে-ধৃষ্টতার শাস্তি সাঙ্ঘাতিক।'

'এই দুপুরে আমার সঙ্গে তিনি দেখা করবেন কী!' বিনয় বিস্মিত সুরে বললে, 'খাওয়া-দাওয়ার পর এখন তো তিনি নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছেন!'

'ঘুম—দুপুরে ঘুমোবেন উনি! এ দৃশ্য আমরা কল্পনাও করতে পারি না। এখন তিনি কাচারিতে এসে বসেছেন।'

'কেন, তিনি তামাক খান না? সুগন্ধি তামাক!' জমিদার ভাবতে এক শ্লথ-মন্থর মাংসপিণ্ড বিনয়ের মনে পড়লো।

'দাঁতে করে সুপুরিটিও তিনি কোনো দিন কাটেননি।'

'চলুন। কোনো ডাকই আমি উপেক্ষা করবো না। কিন্তু

ভারি আশ্চর্য লাগছে!' বিনয় চলতে-চলতে বললে, 'আমাকে উনি চিনলেন কেমন করে ?'

অনাথনাথ আর কোনো কথা বললো না।

সোনালি পেরিয়ে ও-পারে এসে বিনয় বললে, 'মাইল চারেক তো রাস্তা, ও আমি হেঁটেই যেতে পারবো।'

'সর্বনাশ!' অনাথনাথ ব্যস্ত হয়ে উঠলো : 'খালি পালকি ফিরে যাবে নাকি ? গর্দান যাবে যে সবাইকার।'

'সমস্ত শরীর আমার ভিজে গেছে, কাপড়ে-জুতোয় কাদা, ভিতরের মখমলের আসন যে নষ্ট হয়ে যাবে।'

'কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে না। উঠুন।'

'পালকিতে চড়বার আর আমার মান নেই।'

'আমাদের জমিদার আপনার মানের কথা ভাবেননি। ভেবেছেন নিজের মানের কথা।' নায়েব সানুনয় ভঙ্গিতে হাত জোড় করলো।

পালকি এসে দাঁড়ালো কাচারি-বাড়ির সমুখে।

সঙ্গে-সঙ্গে কে-একজন ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললে, 'আসুন এদিকে।'

নায়েবের জিম্মা থেকে বিনয় এল এখন সরকারের হেপাজতে।

যে ঘরে বিনয়কে নিয়ে আসা হলো, সেটা স্নানের ঘর। বড়-বড় গামলায় জল ধরা, ব্র্যাকেটে সদ্য পাট-ভাঙা কোঁচানো ধুতি, নতুন তোয়ালে ও গেঞ্জি, দেয়ালে আটকানো-কাঠের

তাকের উপর তেল, সাবান, দাঁত মাজবার পেষ্ট আর ব্রাশ—সব নতুন, সদ্য-ক্রীত। ওদিকে একটা ড্রেসিং-টেবিলের উপর সাজানো যত স্নানান্তের সরঞ্জাম।

'এটা আমাদের গেস্ট-হাউসের বাথরুম।' সরকার বললে।

'কিন্তু এখানে কেন?' বিনয় যত না বিস্মিত তার বেশি বিরক্ত হয়ে বললে, 'আপনাদের বাবু কি স্নানের ঘরে এসে দেখা দেন নাকি?'

'না, না, বাবু আসবেন কেন? আপনার জন্যেই এ-সব ধুতি-গেঞ্জি। আপনিই এখানে চান করে নিন।' সরকার ঈষৎ মুরুব্বিয়ানা-চালে বললে, 'বৃষ্টিতে আপনার জামা-কাপড়গুলি নোংরা হয়ে গেছে। বাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন, বেশ-বাসে একটু ছিরি-ছাঁদ আনতে হয় তো!'

'কেন, বেশ-বাস যাদের অপরিচ্ছন্ন তাদের সঙ্গে আপনাদের বাবু দেখা করেন না বুঝি?'

'না, না, তা কেন!' সরকার আমতা-আমতা করতে লাগলো। 'তবু অত বড় একটা মানী লোকের সামনে এমন ভাবে দেখা দেওয়া কি ঠিক?'

'তা আপনাদের ঐ মানী লোকই বিচার করুন। কোথায় আপনাদের বাবু?' বলে বিনয় সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা কাচারি-বাড়ির দিকে রওনা হলো।

'শুনুন, শুনুন, আমার অন্যায় হয়েছে—দাঁড়ান, কথাটা

আমার ও-ভাবে বলা ঠিক হয়নি—আসল কথা হচ্ছে এই—' সরকার তার পিছে-পিছে চললো।

কিন্তু বিনয় কর্ণপাত করলো না। সোজা কাচারি-ঘরে ঢুকে ফরাসে-সমাসীন গৌরবর্ণ সুদর্শন এক ভদ্রলোককে সামনে দেখতে পেয়ে সে সরাসরি জিগগেস করলে একটু-বা পরুষ কণ্ঠে: 'আপনিই কি সাড়ে সাত-আনির দিগিন্দ্র সান্যাল?'

ভদ্রলোকের চোখে-মুখে একটা বিদ্যুৎ ঝল্‌কে উঠলো। বললেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি—তুমি কে?'

'আমি? আমি মোহনপুরের বিজয়নারায়ণ মৈত্রের—ধরুন, আমি কেউ নই, আমি এমনি একজন মানুষ, পথিক—'

দিগিন্দ্র হাসলেন। বললেন, 'তোমার জন্যে আমি পালকি পাঠিয়েছিলুম।'

'কিন্তু এখন দেখছি আমাকে অপমান করাই আপনার উদ্দেশ্য ছিল।'

দিগিন্দ্র তাঁর মুখের হাসিটি অস্ত যেতে দিলেন না। বললেন, 'কি করে বুঝলে?'

'আপনার ধারণা আপনার সঙ্গে কেউ নগ্ন পায়ে দেখা করতে এলে আপনার অবমাননা হয়। কিন্তু কে চায় আপনার সঙ্গে সেধে দেখা করতে? আমি চেয়েছি?'

'নিশ্চয়ই না। আমিই নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছি তোমাকে। তোমাকে তো গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসতে বলিনি যে তোমার

কোমরে দড়ি বেঁধে তোমাকে পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে আসবে। তোমাকে নিয়ে এসেছি রাজ-অতিথি করে।'

'কিন্তু সোজা এখানে না এনে আমাকে বাথরুমে নিয়ে যাবার কারণ কী?' বিনয় তেজী গলায় বললে, 'আপনার কি মনে হয় ময়লা কাপড়ে ধূলো-পায়ে আপনার সঙ্গে কারুর দেখা করার অধিকার নেই? আপনার প্রজাদের কি আপনারই মতো পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ, না, আপনি এতই গর্বিত যে প্রজাদের সঙ্গে দেখা করতে আপনি ঘৃণা বোধ করেন?'

দিগিন্দ্র বিনয়ের উদ্দীপ্ত চক্ষুর দিকে চেয়ে রইলেন, কিন্তু নিজে উত্তেজিত হলেন না। বললেন, 'তবে এরা সব কে আমার চারদিকে?'

বিনয়ের এবার দৃষ্টি পড়লো ফরাসের নীচে সমবেত গ্রাম্য প্রজাদের উপর। চেহারা দেখে চিনতে এদের দেরি হয় না। নায়েব-গোমস্তা ডিঙিয়ে সোজা জমিদারের কাছে দরবার করতে এসেছে।

'তবে আমার বেলায় আপনার এই অদ্ভুত আদেশ কেন? কেন আমি আমার গায়ের ধূলো-কাদা না ধুয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারবো না? আমি কি আপনার এ-সব মলিন প্রজাদের চেয়ে আলাদা?'

'কে বলে তোমাকে আমার এ আদেশ?'

বিনয় নিকটবর্তী সরকারকে দেখিয়ে দিল।

'বলেছেন অমন কথা ?' দিগিন্দ্রের অগ্নিময় দৃষ্টি সরকারের দিকে ধাবিত হলো।

বিবর্ণ মুখে নত চক্ষে সরকার বললে, 'ঠিক অমন ভাবে বলিনি—'

'বলেছেন, আপনাদের বাবুর মতো মানী লোকের সামনে এমন ছিরি-ছাঁদহীন পোষাকে দেখা করাটা সঙ্গত হবে না, এবং সেই জন্যেই আমাকে স্নান করে সর্বাগ্রে পরিচ্ছন্ন হতে হবে।' বিনয় স্পস্ট, নির্ভীক কণ্ঠে বললে।

'বলেছেন এমন কথা ?'

মিথ্যা বলাটা সরকারের পক্ষে কঠিন না হলেও, এখন, এ-মুহূর্তে, কেন-কে-জানে, মুখে মিথ্যা এলো না। হয়তো মনে করলে যে মিথ্যা সে যত জোরের সঙ্গেই বলুক না কেন, এ-যাত্রায় প্রভু বিনয়কেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করবেন। তাই সে কানের পিঠ চুলকোতে-চুলকোতে বললে, 'বলেছি।'

'বলেছেন ?' দিগিন্দ্র শিখার মতো জ্বলে উঠলেন। বললেন, 'মাপ চান, মাপ চান বিনয়ের কাছে! বাড়ি থেকে ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে বলে বলতে চান ওর কোনো মান নেই ? গরিব হোক, দুর্বল হোক, মানুষের নিজস্ব যে মান, তার মাঝে তারতম্য কোথায় ? সবাই সমান, আর কিছুতে না হোক, মানে সবাই সমান।'

অনুতপ্ত সরকার মিনতিময় গলায় বললে, 'আমাকে মাপ করুন।'

'হাতে ধরে মাপ চান!' দিগিন্দ্র হুঙ্কার করে উঠলেন।

সরকার বিনয়ের হাত চেপে ধরলো। বিনয়েরই এখন উলটে ভদ্রলোকের জন্যে সহানুভূতি হলো, কেননা লোকচক্ষে তাঁর সম্মান এভাবে খর্ব হতে দেওয়াটাও কেমন তাকে পীড়া দেয়। সে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, 'দরকার নেই এ অভিনয়ে। গায়ে-কাপড়ে ধূলো-কাদা নিয়েই যখন আপনার প্রভুর দেখা পেয়ে গেছি, আপনার গায়ে-পড়া হিতোপদেশের যে দাম নেই তাতেই আমি সুখী। যান, সামান্য বালি হয়ে সূর্যের চেয়ে বেশি তাত দেখাবেন না।' বলে দিগিন্দ্রের দিকে ফিরে তাকিয়ে সে বললে, 'এখন বলুন, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন কেন?'

দিগিন্দ্র হাসিমুখে বললেন, 'এখন তোমাকে বাথরুমে যেতে বলতে পারি?'

'তার মানে?'

'সমস্ত দিনে আজ তুমি চান করবে না? খাবে না চারটি? টই-টই করে ঘুরে বেড়াবে?' দিগিন্দ্রের গলায় স্নেহ উচ্ছল হয়ে উঠলো।

'চান করবো, খাবো—তা, এখানে কেন?'

'এখানে খেতে কিছু দোষ আছে? আমি তোমার বাবার —ব্রজনারায়ণ, মানে বিজয়নারায়ণের শত্রু হতে পারি, কিন্তু তোমার তো আমি শত্রু নই।' দিগিন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন।

দিগিন্দ্র যে কত সুন্দর পুরুষ, তার দাঁড়াবার পর যেন তা আরো ভালো করে বোঝা গেল। সৌন্দর্য তাঁর বয়সের অল্পতায়,

গায়ের রঙে বা দীর্ঘায়ত চেহারায় নয়, সৌন্দর্য তাঁর ব্যক্তিত্বের কাঠিন্যে, প্রভুত্বের বলশালিতায়। এবং তারই প্রতীক তাঁর ঐ চেহারা। বিনয় মুগ্ধ, অভিভূত হয়ে গেল।

দিগিন্দ্র বললেন, 'তোমার সত্যিকারের পরিচয় যে তোমার কাছে এতদিন অজানা ছিল তাই আমি জানতুম না। বংশী, মানে আমার স্পাই, গুপ্তচর, যখন এসে আজ খবর দিলে যে তুমি তোমার সত্য পরিচয় পেয়ে মিথ্যে-মিথ্যে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছ, তখন আমার মন অবোধ তোমার জন্যে কেঁদে উঠলো। তখনই চারদিকে লোক পাঠালুম তোমার জন্যে। ছেলেমানুষ, আঘাতের প্রথম ধাক্কায় কখন কী করে বস, কে জানে? ভাবলুম, তোমাকে রক্ষা করতে হবে বিপদের থেকে। বোঝাতে হবে, যাই তুমি শুনে থাকো বা ভেবে থাকো, সংসারে তুমি নিরাশ্রয় নও। ব্রজনারায়ণ, মানে বিজয়নারায়ণ আমার শত্রু হতে পারেন, কিন্তু তাঁর ছেলের এ দুর্দিনে যদি না আমি মিত্রতা দেখাই, তবে সেই শত্রুতার মধ্যে কোনোই মহিমা থাকবে না। তাই বন্ধুর মতো, শুভার্থীর মতো গোটাকতক কথা তোমাকে বলবো বলে ডেকে পাঠিয়েছি। নাও, চট করে চান করে নাও, এত বেলা পর্যন্ত উপোস করে থাকা আমার অভ্যেস নেই।'

বিনয় স্তম্ভিত হয়ে গেল। বললে, 'আমার জন্যে আপনি এখনো অভুক্ত আছেন?'

দিগিন্দ্র অল্প একটু হাসলেন। বললেন, 'তাই তো রীতি। তুমি যে আজ আমার অতিথি—রাজ-অতিথি।'

সরকারের সঙ্গে বিনয় এবার বিনাতর্কে বাথরুমের দিকে অগ্রসর হলো।

স্নান সেরে খাবার-ঘরে ঢুকে বিনয় দেখলো, দিগিন্দ্র আগে থেকেই আসনে বসে তার জন্যে অপেক্ষা করছেন। থালার চারপাশে রাশি-রাশি বাটি সাজানো হচ্ছে দেখে বিনয় বললে, 'ষোড়শ ছেড়ে উপচারের সংখ্যা ছত্রিশ হয়েছে দেখছি। কিন্তু আমার জন্যে কি আর এত উপকরণের প্রয়োজন আছে?'

দিগিন্দ্র বললেন, 'কেন, নেই কেন? তুমি কম কিসে?'

'কেন আপনি জানেন না আমার সব ইতিহাস?' বিনয় একটু বিস্মিত হলো।

'জানি বৈ কি!'

'কী জানেন?'

'জানি, তুমি ব্রজনারায়ণ, মানে বিজয়নারায়ণের পোষ্য ছেলে।'

'আর এ-ও নিশ্চয় জানেন যে আমার একটি ছোট ভাই আছে, নাম মাধব।'

'জানি বৈ কি। সে ঐ ব্রজনারায়ণ, মানে বিজয়নারায়ণের সত্যিকারের ছেলে।'

ম্লান হাসি হেসে বিনয় বললে, 'তা হলে তো আপনি সমস্তই জানেন দেখছি। কিন্তু বিজয়নারায়ণকে বারে-বারে আপনি ব্রজনারায়ণ বলছেন কেন?'

'তা ছাড়া আর কি!' সঘৃণ স্বরে দিগিন্দ্র বললেন, 'ওটার

মধ্যে কোনো মনুষ্যত্ব আছে নাকি? সবই তো সেই ব্রজলাল। হাঁচতে বললে ব্রজলাল, কাশতে বললে ব্রজলাল। কানু ছাড়া যেমন গীত নেই তেমনি ব্রজ ছাড়াও ওঁর বুলি নেই। সম্পত্তিটি ব্রজলালের হাতে তুলে দিয়ে উনি নেশায় টং হয়ে আছেন। তুখোড় ব্রজলাল সেই ফাঁকে দু'হাতে লুটে খাচ্ছে। কী যে সে সর্বনাশ করছে দিনে-দিনে. উনি তা কল্পনাও করতে পারছেন না। একদিন যে ওঁর নেশার বরাদ্দ রসদও জুটবে না, তা ওঁর খেয়াল নেই। এমন অকর্মণ্য! তাই ওঁর নাম বদলে আমি নাম রেখেছি ব্রজনারায়ণ। তুমি বোস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

ক্ষণকালের জন্যে বিনয়ের চোখে নিষ্ঠুর একটা দীপ্তি ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল। সে শান্ত, একটু-বা বিমর্ষ স্বরে বললে, 'ব্রজ-নায়েবের দম্ভ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। ও এমন একটা ভাব দেখাচ্ছে যেন জমিদারিটা ওর নিজের! বাড়ির কর্তা-গিন্নিও উদাসীন, বরং প্রশ্রয়ই ওকে দিয়ে আসছেন। ওর এই আধিপত্য, এই স্বেচ্ছাচার আমারই একমাত্র অসহ্য ছিল, এবং যদিও সঙ্ঘর্ষে আমি ওর কাছে বারে-বারেই হেরে যাচ্ছিলুম, তবুও, আপনাকে বলতে পারি, মনে-মনে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, একদিন-না-একদিন ওকে তাড়াবোই, ধূলিসাৎ করে দেবো ওর ঐ অহঙ্কার, কর্তৃত্বের সিংহাসন থেকে নামিয়ে নিয়ে আসবো ওকে আমার পায়ের তলায়। ও যে শুধু আমার চাকর, এ কথা ওকে হাড়ে-হাড়ে বুঝিয়ে দেবো আমি।'

'কিন্তু সে সঙ্কল্প তোমার গেল কেন?'

'সমস্তই গেল, সম্পত্তিই আর রইলো না, সেই সঙ্কল্প তবে আর থাকে কি করে ?' বিনয় আবার কষ্টে একটু হাসলো। বললে, 'আমি তো এখন গৃহহীন, আশ্রয়হীন পথের পথিক। চাল নেই, চুলো নেই, গাছতলাই আমার সম্বল। কে কার আধিপত্য নষ্ট করে—বলে হাসলেন একটু ভগবান! তাই তো বলছিলুম, উপোস করে যাকে হয়তো কাটাতে হবে, কিম্বা জন খেটে বড়জোর যাকে নূন দিয়ে শুধু মোটা ভাত খেতে হবে, তাকে এত সব থালা-বাটি সাজিয়ে খেতে দেয়া কেন ?'

'কে বললে তুমি গৃহহীন, কে বললে তোমার আধিপত্য নষ্ট হয়ে গেছে ?' দিগিন্দ্র জায়গা ছেড়ে উঠে বিনয়ের হাত ধরলেন ; তাঁর মুখোমুখি তার জন্যে নির্দিষ্ট জায়গায় তাকে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'কে বললে তোমাকে শুধু নূন দিয়ে মোটা ভাত খেতে হবে ?'

গভীর বিস্ময়ের মধ্যে থেকে বিনয় বললে, 'নিজের ছেলে হবার পর কি পোষ্য ছেলের আর কোনো অংশ বা স্বত্ব থাকে ?'

'কে বললে থাকে না ?'

'ব্রজ-নায়েব বললে, 'বাবার মৃত্যুর পর জমিদারি সম্পূর্ণ মাধবের ; আমি পোষ্য, আমি পরগাছা, সম্পত্তিতে আমার আর কোনো স্বত্ব-স্বামিত্ব নেই—'

'নায়েব বললে!' দিগিন্দ্র হঠাৎ ঘর-দোর কাঁপিয়ে তুমুল অট্টহাস্য করে উঠলেন। বললেন, 'কেন, তোমার বাবা, ব্রজনারায়ণকে কিছু জিজ্ঞাসা করোনি ? না, তিনি বললেন,

ব্রজের মতই আমার মত!' বলে তিনি আবার হেসে উঠলেন শব্দ করে।

বিনয়ের বুক কাঁপতে লাগলো। সে বললে, 'তবে—তবে আমার আছে নাকি কিছু স্বত্ব?'

'আছে বৈ কি, নিশ্চয়ই আছে। তুমি ডাক্তারি পড়ছ, আইনের কিছুই জানো না। এই ভেবে ধূর্ত ব্রজ-নায়েব তোমাকে একটা ধোঁকা দিতে চেয়েছে।' ওর মতলবই হচ্ছে তোমাকে কোনোরকমে সরিয়ে দিয়ে সম্পত্তিটি গ্রাস করা! তোমাকে বলে দিয়েছে যে তুমি পথের ভিখারী, কোনো অধিকারই তোমার আর নেই? কী হারামজাদা দেখেছ!' দিগিন্দ্র থালার দিকে মনোনিবেশ করে বললেন, 'নাও, আরম্ভ করো। এ-সব কথা এখন থাক, খাওয়া-দাওয়ার পর আলোচনা হবে 'খন। নইলে, উত্তেজিত হয়ে কিছুই তুমি খেতে পারবে না।'

'না, আমি খাচ্ছি।' বিনয়ের মুখে যেন স্বাদ আর স্পৃহা ফিরে এল, খেতে-খেতে বললে, 'আপনি বলুন, এই উত্তেজনা আমার ক্ষুধাকে সাহায্য করবে। বলুন, এই আবিষ্কারের পরেও কি আমি স্বত্ব দাবি করতে পারি? কত আমার অংশ এখন সম্পত্তিতে? তেমনি আট আনা?'

'না, এক-তৃতীয়াংশ, পাঁচ আনা চার পাই। বাকি দশ আনা আট পাই মাধবের। পোষ্য ছেলের থেকে সত্য ছেলের এই শুধু প্রায় তিন আনার তারতম্য হয়েছে বাঙলা দেশে।'

বিনয়ের উদ্দীপ্ত মন আবার কেমন নিস্তেজ হয়ে এল।

মাধবের চেয়ে তার অংশ কম! সে বড়, সে জ্যেষ্ঠ, সে দাদা, তবু অধিকারে মাধবের চেয়ে সে ছোট; তার আসন, তার মর্যাদা মাধবের চেয়ে নীচে! সে এক ঢোক জল খেল। বললে, 'পাঁচ আনা হোক তিন আনা হোক, কী হবে আমার সম্পত্তি দিয়ে? আমি সমস্ত মাধবকে দিয়ে দিলুম।'

দিগিন্দ্র এক পলকে বিনয়ের মনের ভিতরটা স্পস্ট দেখে নিলেন। বললেন, 'সে তো ভালো কথা। কিন্তু মাধব আগে বুঝে নিতে শিখুক। এখনই যদি দিয়ে ফেল তবে তা আর কোনো দিন মাধবের হাতে পৌঁছুতে পাবে না, মাধবের বিষয়-বুদ্ধি হবার আগেই তা ব্রজ-নায়েবের জঠরে গিয়ে প্রবেশ করবে। দিয়ে যে দেবে, তোমার পাঁচ আনাই আগে রক্ষা করো। নইলে দেবে কী?'

বিনয় চুপ করে খেতে লাগলো। আবার যেন সে স্বাদ পেতে লাগলো খাবারে।

দিগিন্দ্র বললেন, 'আসল কি জানো? আসল হচ্ছে অধিকার, আধিপত্য। লাভের অঙ্কটা পাঁচ আনা কি পাঁচ পাই সেটা কিছু নয়, এক পয়সাও যার অংশ আছে, অধিকারের বেলায় তার সেই ষোল আনা। মাধবকে তুমি সব দিতে পারো তা মানি, কিন্তু দেবার মতো কিছু রাখতে হবে তো শেষ পর্যন্ত। কে জানে তোমাকে সরিয়ে ফেলে কী মতলোব করেছে ব্রজ-নায়েব! যেটুকু বাধা ছিল তার স্বেচ্ছাচারের, সেটুকুও আর নেই। কোনো দুর্বল মুহূর্তে ব্রজনারায়ণকে দিয়ে সে

নিজের অনুকূলে কোনো উইলই বা করিয়ে নেয় কিনা তাঁর ঠিক কী !'

'অসম্ভব।' বিনয় মেরুদণ্ড সোজা করে বসলো। বললে, 'না, আমি ফিরে যাবো। আমার অধিকার যদি এখনো থাকে, তা আমি ক্ষুণ্ণ হতে দেব না কিছুতেই।'

'নিশ্চয়ই না। এই তো পুরুষসিংহের মতো কথা।' দিগিন্দ্র গম্ভীর গলায় বললেন, 'ট্রেনে যদি আমি টিকিট কেটেই উঠেছি তবে কিছুতেই কোনো অত্যাচারেই আমার জায়গা ছাড়বো না আমি। সমাজ বা আইন আমাকে যেটুকু জায়গা দিয়েছে, তাই আমি আঁকড়ে থাকবো। কী সাধ্য ব্রজ-নায়েবের যে তোমাকে গায়ের জোরে ঠেলে সরিয়ে দেবে? তোমার প্রতিজ্ঞাটা ভুলে যাবার কোনোই কারণ হয়নি। নিজে ভোগ করবে বলেই হোক বা আর-কাউকে বিলিয়ে দেবে বলেই হোক, পাঁচ আনা চার পাই অংশটা তোমার কম নয়।'

বিনয়ও গম্ভীর গলায় বললে, 'না, প্রতিজ্ঞাটা আমি আবার মনে-মনে আওড়ে নিচ্ছি।'

বাকি খাওয়াটা নিঃশব্দে শেষ হলো। দিগিন্দ্র সান্যালের সমস্ত রকমের উন্নতি-প্রচেষ্টার বাধা হচ্ছেন ঐ ব্রজলাল। তাঁকে উৎপাটিত করা চাই। কণ্টক দিয়ে কণ্টক তোলাই প্রশস্ত।

খাওয়া-দাওয়ার পর বিনয়কে দিগিন্দ্র তাঁর মন্ত্রণাকক্ষে নিয়ে এলেন। বললেন, 'একটা উপদেশ শুধু আমার মেনে চোলো— যদি কৃতকার্য হতে চাও। কখনো চঞ্চল বা অসহিষ্ণু বা

উত্তেজিত হবে না। চুপচাপ থাকবে। দেখাবে কিছুই তুমি জানো না, কিছুই তুমি বোঝ না, তুমি অতি গোবেচারা। আর, নিঃশব্দে স্থিরলক্ষ্য হয়ে এক পা এক পা করে এগিয়ে যাবে।'

বড় কঠিন উপদেশ—বিনয় যেন বিশেষ উৎসাহিত হতে পারলো না।

কিন্তু উৎসাহিত হলো পরের কথাটা শুনে।

'এগিয়ে যাবে কোথায়? এগিয়ে যাবে ব্রজ-নায়েবকে উচ্ছেদ করতে। তার জন্যে কী চাই? চাই হাতে-নাতে প্রমাণ যে সে একজন প্রবঞ্চক, সে তোমার বাবাকে লুকিয়ে জমিদারিতে কামড় বসাচ্ছে। আমি দিতে পারি তার একটা প্রমাণ। আর জেনো, যতই না কেন চেঁচামেচি করো, মুখের কথায় কিছুতেই কিছু হবে না, তোমার বাবাকে লিখিত প্রমাণ দেখাতে হবে যে ব্রজ-নায়েব চোর। তবেই ব্রজনারায়ণ সত্যিকাঁর বিজয়-নারায়ণ হয়ে উঠবেন।'

'দিন, দেখান আমাকে সেই প্রমাণ।'

'চঞ্চল হবে না, অসহিষ্ণু হবে না, উত্তেজিত হবে না। তবে শোন—'

দিগিন্দ্র যা বললেন, ঘোরপ্যাঁচ বাঁচিয়ে সংক্ষেপে তা এই।

অশ্বত্থতলা বলে বড় একটা মৌজা বা গ্রাম আছে। সেটার অংশ নিয়ে একটা মোকদ্দমা চলেছে দিগিন্দ্র আর বিজয়নারায়ণের মধ্যে। ওটার কতক অংশ আগে গিয়াসুদ্দিন বলে এক মুসলমান জমিদারের ছিল, বিজয়নারায়ণ তার কাছ থেকে সেটা কিনে

নেন। বিজয়নারায়ণ তো আর তাঁর মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনা করেন না, করে সব ঐ ব্রজলাল, বিজয়নারায়ণ শুধু মামুলি দস্তখৎ করেই খালাস। এখন মামলায় বিজয়নারায়ণের পক্ষে এই বলে জবাব দেয়া হয়েছে যে গিয়াসুদ্দিনের থেকে সম্পত্তি খরিদ করেছিল সে নিজে নয়, তার নায়েব ব্রজলাল। অর্থাৎ টাকাটা হলো বিজয়নারায়ণের, অথচ সম্পত্তির মালিক হলেন ব্রজলাল।

'এতদূর?' বিনয়ের চোয়ালের রেখাদুটো দৃঢ় হয়ে ফুটে উঠলো।

'তোমার বাবা নিশ্চয়ই জানেন না তোমার নায়েবের এই কীর্তি। তুমি যদি তাঁকে মুখে গিয়ে বলো এ-কথা, তিনি ককখনো তা বিশ্বাস করবেন না।'

'কখনো না। এমন মোহান্ধ তিনি।' বিনয় সায় দিল।

'তাঁকে লিখিত প্রমাণ দিতে হবে।'

'পাবো কোথায়?'

'আমি সন্ধান বলে দিচ্ছি।' দিগিন্দ্র ষড়যন্ত্রীর মতো সন্নিহিত হয়ে বসে নিম্ন কণ্ঠে বললেন, 'দলিলপত্র সব ব্রজলালের জিম্মাতেই তো থাকে?'

'হ্যাঁ, স্ট্রং-রুমে, ফায়ার-প্রুফ ক্যাবিনেটে। ডবল তালা-দেয়া। চাবিগুলি প্রায় হাতুড়ির মতো দেখতে। সে-ঘরে ঢুকে দলিল বেছে উদ্ধার করে নিয়ে আসা সম্ভব হবে না।'

'তা হবে না আমি জানি। কিন্তু সেই দলিল আসছে-সোমবার ব্রজলাল সেই ঘর থেকে বের করে আনবে। আসছে-

সোমবার সেই দলিল আদালতে দাখিল করবার শেষ দিন। দলিল দাখিল করতে ব্রজলাল আর নিজে সদরে যাবে না, আর-কোনো তদবিরকারকে পাঠিয়ে দেবে। তুমি একটু তক্কে-তক্কে থেকে সেই তদবিরকারের থেকে সেটা উদ্ধার করে নেবে। ঐ শুধু সুযোগ, নইলে আদালতে একবার আসল দলিল দাখিল হয়ে গেলে তা আর পাওয়া যাবে না। পারবে কি বাগাতে?'

'নিশ্চয়ই পারবো। মামলার তদবিরের ভার মামলা-সেরেস্তার মুহুরি কালীপদর উপর। ছলে না পারি, বলে ছিনিয়ে নেব সে-দলিল। আপনি কিছু ভাববেন না।'

দিগিন্দ্র উৎসাহব্যঞ্জক হাসি হাসলেন। দলিলখানা নিয়ে সম্প্রতি তিনি খুবই ভাবনায় পড়েছেন।

নয়

কারুর কাছেই কোনো সদুত্তর মাধব সংগ্রহ করতে পারেনি —তার দাদা কোথায়। মা মুখ বেঁকিয়ে বলেছেন, জানি না, বাবা শুধু বলেছেন, ফিরে আসবে। যাওয়ার জায়গাই যদি অজানা তবে ফিরে আসার ভরসা কী! মাধব রমুকে পাঠিয়ে দিল কাচারি-বাড়িতে খোঁজ করতে। রমু ফিরে এসে বললে, 'নায়েববাবু বলে দিলেন বড়দাদাবাবুর কলেজ খুলতেই কোলকাতায় চলে গেছেন।'

মাধব বিজ্ঞের মতো হাসলো। ছুটি-ছাটাতে দাদা এলেই প্রথমে মাধব নিজেকে প্রস্তুত করে রাখবার জন্যে দাদাকে জিগগেস করে রাখে সে যাবে কবে। তারিখটা যদিও তার মনে থাকে না, বারটা তার কঠিন লাগে না একটুও। এবার দাদা বলে রেখেছে মঙ্গলবার যাবে। আজ কী বার?

'আজ কী বার, রমু?'

'বার?' হাঁ করে চোখ কপালে তুলে রমু অনেকক্ষণ ভাবলো, পরে বললে, 'দাঁড়াও, কাচারি-বাড়ি থেকে জিগগেস করে আসি।' এবং এক ছুটে জেনে এসে সে বললে, 'শুক্কুরবার।'

'তবে বলে দাও নায়েববাবুকে, দাদা যায়নি কোলকাতায়। আমার সঙ্গে দেখা না কোরে সে যেতে পারে?' মাধব একটা বীরত্বের ভঙ্গি করলো।

যে যাই বলুক, মাধব জানে দাদা কোথায়! কিন্তু মার আজকে বড়ো কড়া পাহারা। ঘর থেকে বারান্দায় বেরুনো পর্যন্ত তার আজ বারণ।

অগত্যা সে জানালা ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে· পথের দিকে চেয়ে কতক্ষণে তার দাদা ফিরে আসে।

সন্ধ্যায় চারদিক ঘোর-ঘোর হয়ে আসছে তবু দাদার দেখা নেই। দাদা আজ বাড়ি না ফিরলে সে খাবে কি করে, ঘুমুবে কি করে? আর, সব চেয়ে তার এই ভেবে আশ্চর্য লাগছে,— দাদার জন্যে সে যত ভাবছে, মা কেন তত ভাবছে না? মা কেন দাদার পথ চেয়ে এমনি জানলা ধরে বসছে না, কেন দিকে-দিকে লোক পাঠিয়ে দিচ্ছে না খুঁজতে? দাদা যে সমস্ত দিন কিছু খায়নি, তা কি মার খেয়াল নেই?

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল সে স্থিরচক্ষে সমুখের পথের দিকে চেয়ে, হঠাৎ পিছন থেকে দুহাতে কে মাধবের চোখ চেপে ধরলো।

মাধব পুলকিত হয়ে উঠলো। চোখের উপরকার হাতদুটো সে চেপে ধরে আগন্তুককে জিগগেস করলে, 'বলো তো আমাল নাম কী?'

'আর অমনি তুমি আমার গলার আওয়াজ শুনে চিনে নাও, আমি কে। কেন, চোখের উপর হাতের ছোঁয়া দেখে বুঝতে পারো না?' বলে চোখ ছেড়ে দিয়ে বিনয় হাসতে লাগলো।

ঢেউয়ের মতো মাধব ঝাঁপিয়ে পড়লো বিনয়ের বুকের

উপর। বিনয়ের কাঁধের মধ্যে মুখ লুকিয়ে সে বললে, 'আমি তোমাল জন্যে কানছিলুম, দাদা।'

তার পিঠে ও মাথায় সস্নেহে হাত বুলুতে-বুলুতে বিনয় বললে, 'কাঁদছিলে? কেন?'

'তুমি লাগ কলেছ কেন?'

'রাগ করেছি? কার উপর রাগ করবো?'

'আমাল উপর!' বলে মাধব তেমনি মুখ লুকিয়ে হাসতে লাগলো যেন খুব একটা মজার কথা বলেছে।

শিশুর মুখের এই আজগুবি কথার কোনো অর্থ আছে কিনা তাই বোধহয় বিনয় একটু নীরবে চিন্তা করছিলো, এমন সময় কোথা থেকে সেখানে সুনয়নী ছুটে এলেন। যেন কী-একটা হঠাৎ ভয় পেয়েছেন এমনি তাঁর চেহারা!

সত্যিই, অসম্ভব ভয় পেয়েছেন তিনি। বিনয় ফিরে এসেছে বলে নয়, বিনয় মাধবকে জড়িয়ে ধরেছে বলে। এখনো যে বিনয় মাধবকে সত্যিকার স্নেহ করতে পারে এ-কথা সুনয়নী আর বিশ্বাস করতে পারেন না। বিনয় জেনে গেছে তার স্বরূপ, জেনে গেছে তার স্থান, আর সর্বোপরি, জেনে গেছে যে মাধবের আবির্ভাবটা তার জীবনে একটা কদর্য অভিশাপ। মাধবের প্রতি তার মন আর কিছুতেই প্রসন্ন থাকতে পারে না—মাধব তার আজ সব চেয়ে বড় শত্রু। এই মনোভাব নিয়েই সুনয়নী দেখলেন এখন বিনয়কে, এবং দেখে একেবারে অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর একটা উদ্ভট উপমা

মনে হলো। মনে হলো, ধৃতরাষ্ট্র যেন লৌহভীম জড়িয়ে ধরেছে।

বিনয় বললে, 'করেছিই তো। তুমি আমার কাছে আসো না কেন?

'আসতে হবে না কাছে। ছেড়ে দাও।' কোত্থেকে পাগলের মতো ছুটে এসে সুনয়নী মাধবকে বিনয়ের বুক থেকে এক ঝটকায় ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন।

এর চেয়ে ভূমিকম্পে বাড়ি-ঘর ভেঙে পড়লেও যেন বিশ্বাস করা সহজ ছিল। বিনয় অসাড়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। শুধু বলতে পারলো: 'এর মানে?'

'এর মানে অত্যন্ত স্পস্ট।' সুনয়নী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন: 'মান-সম্মান খুইয়ে যখন এ-বাড়িতেই ফের ফিরে এসেছ দুটো ভাতের জন্যে, তখন নিজের জায়গাতেই থেকো, তার উপরে আর উঠতে চেয়ো না। ওঁর তুমি যাই হও, মাধবের তুমি কেউ নও, সেটা মনে রেখো; তাই আত্মীয়তা দেখাতে অত কাছে ঘেঁসে এসো না।'

বিনয়ের ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগলো থরথর করে। কিন্তু দিগিন্দ্র সান্যালের কথাটা তার মনে পড়ে গেল—চঞ্চল হবে না, অসহিষ্ণু হবে না, উত্তেজিত হবে না। সে তাই আর একটিও কথা না বলে কারু দিকে না তাকিয়ে ঘর থেকে চলে গেল।

'দাদা—আমি দাদাল কাছে যাব্দো।' বিনয়ের যাওয়ার দিকে একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে মাধব আর্তনাদ করে উঠলো।

সুনয়নী তাকে কী করে বোঝাবেন যে যাকে সে দাদা বলছে, আসলে সে একটা ডাকাত—তার বুকের নিচে রয়েছে ছোরা, তার নিশ্বাসে রয়েছে বিষ, তার দৃষ্টিতে রয়েছে অভিশাপ! কী করে বোঝাবেন যে সে তার দাদা নয়!

প্রথমে ধমক, পরে প্রহার—তবু মাধবের কান্না দ্বিগুণতর হয়ে ওঠে—'আমি দাদাল কাছে যাবো। দাদাগো, আমাকে নিয়ে যাও—'

অগত্যা সুনয়নী দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

বিনয় চঞ্চল হলো না, অসহিষ্ণু হলো না, শুধু নিজের ঘরে এসে অন্ধকারে একটা চেয়ারের উপর চুপচাপ বসে রইলো।

এই চুপচাপই সে থেকে গেল এর পর থেকে। সমস্ত দিন-রাত সে তার ঘরের মধ্যেই বন্ধ হয়ে থাকে, পড়াশোনা করে, কখনো বা পড়ে-পড়ে ঘুমোয়, সংসারের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে দু'বেলা সময়মত দুটো খেয়ে আসে। নইলে সে কারুর সাতেও নেই পাঁচেও নেই—কোথায় কার পাকা ধানে মই পড়লো বা কে জলের অভাবে কাদা চেটে খাচ্ছে, কিছুতেই তার আর কিছু আসে যায় না। সে আর এখন ভাবুক নয়, সে এখন বুদ্ধিমান্।

ব্রজলাল টিপ্পনি কাটলেন: 'বাছাধন এখন একেবারে ঢিট হয়ে গেছে। মুখে আর রা-টি নেই। এতদিনে বুঝতে পেরেছেন কত ধানে কত চাল!'

এর মধ্যে বিনয় একদিন শুধু বিজয়নারায়ণের সঙ্গে একটু কথা বলেছিল, বিজয়নারায়ণ যখন স্নানের আগে তেল মাখাচ্ছিলেন।

'আচ্ছা বাবা, অশথতলা মৌজায় আমাদের অংশ আছে ?' বিনয় জিগগেস করলো।

'আছে বৈ কি।'

'আছে ? কত ?'

'ছ' আনা পাঁচ গণ্ডা।'

'ও-অংশটা কি আমাদের মৌরসী ?'

'না। ওটা আমি কিনেছিলুম গিয়াসুদ্দিন না রইসুদ্দিন পাটোয়ারের কাছ থেকে। নামটা আমার ঠিক মনে নেই। কিন্তু হঠাৎ তোমার আর-সব ছেড়ে এই অশথতলা সম্বন্ধে কৌতূহল হলো কেন ?'

'এমনি। গ্রামের নামটা ভারি সুন্দর।' বিনয় দুর্বলভাবে একটু হাসলো।

এই মলিন হাসিটুকুতে বিজয়নারায়ণও যেন খানিক দুর্বল বোধ করলেন। সুনয়নী যাই বলুক, স্নেহ তুমি জোর করে সরিয়ে ফেললেও, কর্তব্যকে বা ধর্মকে সরাবে কি করে ? এই একটা নিঃস্ব শিশুকে এ-সংসারে তারা নিয়ে এসেছিল কিসের অঙ্গীকারে ? তার ভবিষ্যৎটা শূন্যময় করে দেবার জন্যে নয়। শিশু-বিনয়কে নিয়ে সুনয়নী একদিন কত মাতামাতিই না করেছেন ! কত সাজানো-গোছানো, কত আদর-অভিমান—কিছুরই যেন কোথায় শেষ ছিল না। শুধু সংসার ভরে ওঠেনি, সুনয়নীর হৃদয় উঠেছিল ভরে। কিন্তু আশ্চর্য মায়ের মন ! যেই সে পেয়ে গেল তার নিজের সন্তান, আপনার হৃদয়ের রক্ত

দিয়ে গড়া, অমনি তার মন পরের সন্তানের প্রতি বিমুখ হয়ে উঠলো। অমনি সে এক নিমেষে বুঝে নিল বিনয় পর, বিনয় মেকী, বিনয় বাজে। তার এতদিনের স্বপ্ন হয়ে দাঁড়ালো একটা বিভীষিকা!

মাধবের জন্মাবার পর যতদিন বিনয় জানতো না তার আসল পরিচয়, ততদিন সে মার থেকে দূরে-দূরে থাকলেও এমন যেন ঘৃণ্য, পরিত্যাজ্য ছিল না। কিন্তু যে মুহূর্তে তাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে সে কে, অমনি সে তার এতদিনের স্নেহদাত্রী মার কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছে শত্রু, শাবক-রক্ষিণী পক্ষিণীর কাছে শিকারসন্ধানী ব্যাধের মতো। মাধবকে সে তার দৃষ্টির বাইরে নিয়ে গিয়েই শান্তি পাচ্ছে না—সে চায় এখন বিনয়কেই সবাইর দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে।

বিজয়নারায়ণের মন ম্লান বোধ হতে লাগলো। একদিনের মা যে অন্যদিনে ডা'ন হয়ে যেতে পারে, চোখের উপর না দেখলে তিনি বিশ্বাস করতে পারতেন না। নিজে তিনি যতই দুর্বল হোন বা অলস বা ব্যক্তিত্বহীন হোন, মনের দিক থেকে তিনি বিনয়ে-মাধবে এক আনারও তফাৎ করতে পারছেন না। বরং সংসারে বিনয় এখন অনাকাঙ্ক্ষিত বলেই যেন তার প্রতি তাঁর বেশি করুণা।

সোমবার সকালবেলা আবার বিনয়কে একটু কর্মতৎপর দেখা গেল। নেমে এল সে কালীপদ মুহুরির ঘরে।

'আজ এত সকালে স্নান করেছেন? যাচ্ছেন নাকি

কোথাও ?' বিনয় কালীপদ মুহুরিকে জিগগেস করলে গায়ে পড়ে।

কালীপদ পরম আপ্যায়িত হয়ে বললে, 'হ্যাঁ, সকালের ট্রেনে সদরে যাচ্ছি। মামলা আছে একটা।'

যেন কিছুই জানে না এমনি মুখে বিনয় বললে, 'কার সঙ্গে মামলা ?'

'শোভনডাঙার দিগিন্দ্র সান্যালের সঙ্গে।'

'তা আপনি যাচ্ছেন কেন ? আপনি কি আমাদের উকিল নাকি ?'

কালীপদ হাসলো। বললে, 'মোকদ্দমায় কতকগুলি দলিল দাখিল করবার জন্যে আমাকে যেতে হবে।'

'ও ! সেগুলি খুব বড় একটা বোঝা হবে নাকি ? বাক্সে করে নিয়ে যাচ্ছেন ?'

'না, বোঝা কোথায় ? ছোট্ট একটা পুঁটলি শুধু।'

'কই দেখি। দেখি, আপনার অসুবিধা হবে কিনা।'

'ঐ তো—' কালীপদ সামনের টেবিলের উপর লাল সালু দিয়ে মোড়া ছোট একটা পুঁটলি দেখালো। বললে, 'কেন বলুন দেখি ?'

'দেখলাম ওটার সঙ্গে আরো মাল আপনার উপর চাপানো ঠিক হবে কিনা। সদরে আমার কলেজের একজন বন্ধু আছে, কামাখ্যা মোক্তারের ছেলে। তার কাছে কয়েকখানা বই আপনি পৌঁছে দিতে পারবেন ? আর একটা চিঠি ?'

'স্বচ্ছন্দে। এ আবার এমন কী মাল!' কালীপদ আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে হাসলো। বললে, 'আপনি তবে পাঠিয়ে দিন যা দেবেন। আমি খেয়ে আসি ততক্ষণ।' বলে সে ডেকে উঠলো: 'বংশ, বংশধর!'

দরজার কাছে চাকর-মতন একটা ছোকরা বসে ছিল, সে খাড়া হলো সেই ডাকে।

কালীপদ বললে, 'দরজা-জানলাগুলো বন্ধ কর। বন্ধ করে বাবুর ঘর থেকে বইগুলি নিয়ে আয়।'

'দরজা আপনি বন্ধ করে যান নাকি খেতে? কোনো দরকার নেই বন্ধ করার, আমিই আছি এখানে বসে। বই আর পাঠানো না ভাবছি। একখানা চিঠিই শুধু লিখে দিই। দোয়াত-কলম তো সামনেই আছে, আমাকে একটু শুধু কাগজ দিন দয়া করে। চিঠিটা আমি এখানেই বসে লিখছি। আপনি ততক্ষণ খেয়ে আসুন।'

'ও বংশ, আলমারি খুলে এক তা কাগজ বের করে দে বাবুকে।' টেড়িটাকে ঠিক কায়দায় আননার চেষ্টা করতে-করতে কালীপদ বললে।

কাগজ পেয়ে বিনয় দীর্ঘ এক চিঠি ফাঁদলো, আর অসন্দিগ্ধ কালীপদ দলিলের বাণ্ডিলটা ডেস্কের উপর ফেলে রেখেই খেতে চলে গেল ভিতরে।

বিনয় আর এক মুহূর্তও দেরি করলো না। ত্রস্ত চোখে চাইলো একবার চারদিকে। নেই, কেউ নেই কোথাও। চোখের

পলকের মধ্যে হাত বাড়িয়ে দলিলের বাণ্ডিলটা সে তুলে নিল আর নিশ্বাসপতনের আগে ঘর থেকে গেল বেরিয়ে।

একেবারে সোজা তার ঘরে, দোতলায়। কোথায় রাখবে সেটা লুকিয়ে ঘরের চারদিকে সে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল। যেখানে চোখ যাবার সম্ভাবনা খুব কম, রাখলো সে সেটা তার টেবিলের নীচেকার ওয়েস্ট-পেপার-বাস্কেটের জঞ্জালের মধ্যে। আর, কতক্ষণের জন্যেই বা! বাবা বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে পাশা খেলছেন, খেলাটা একটু মন্দা পড়লেই দলিলের বাণ্ডিলটা সে তাঁর হাতে তুলে দেবে, মুহূর্তে ব্রজলালের বেরিয়ে পড়বে সব জারিজুরি।

বিনয় দেখে আসতে গেল খেলাটার এখন কী অবস্থা—আর দেরি কত! দরজা দিয়ে উঁকি মেরে যেটুকু সে দেখলো ও বুঝলো, তাতে তার বিশেষ উৎসাহ হলো না—খেলোয়াড়দের উৎসাহ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। গায়ে তেল মাখাবার সময় ছাড়া তাঁর আজ মোলাকাত পাবার সম্ভাবনা নেই।

বিনয় ভাবলো, দলিলের বাণ্ডিলটা সঙ্গে নিয়ে বাইসিকেলে করে কোথাও বেরিয়ে পড়াই সঙ্গত—একেবারে শোভনডাঙায়, দিগিন্দ্র সান্যালের বাড়িতে। কিন্তু কে জানে, রাস্তায় ব্রজলাল বা তার দলের কেউ তাকে মারধোর করে তার কাছ থেকে দলিল ছিনিয়ে নেবে হয়তো। তার চেয়ে, বাড়ির ভিতর, আবর্জনার ঝুড়ির মধ্যে লুকিয়ে রাখাটাই নিরাপদ। কোনো গোলমাল হয়, চারদিকে জানাজানি হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে। ঐ ঝুড়ির

'যাচ্ছ কোথায় ?'

চেয়েও আরো নিরাপদ জায়গা কী হতে পারে, তাই ভাবতে-ভাবতে বিনয় তার ঘরে ফিরে এল। স্বভাবতই, ঝুড়ির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বের করতে গেল সে দলিলের বাণ্ডিলটা, কিন্তু কী ভয়ঙ্কর! পুরো পাঁচ মিনিটও হয়নি, এরি মধ্যে দলিলের বাণ্ডিল অদৃশ্য হয়ে গেছে!

বিনয় জানলা দিয়ে চেয়ে দেখলো ছাতা মাথায় দিয়ে কালীপদ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। কালীপদ দলিল ফেলে রেখে যাচ্ছে না নিশ্চয়ই।

উন্মাদের মতো বিনয় নিচে নেমে এল। ফটক খুলে বেরুতে যাবে, ব্রজলালই তাকে ধরে ফেললেন। বললেন, 'যাচ্ছ কোথায়?'

ব্রজলালের মুখের দিকে চেয়ে—কী বলছে কিছু বুঝতে না পেরে—বিনয় বললে, 'কালীপদ দলিল পেয়ে গেছে?'

'পেয়ে গেছে বৈকি।'

'পেলো কি করে?'

'পেলো কি করে?' ব্রজলাল বিকট গলায় হেসে উঠলেন। বললেন, 'তুমি ভাবো দিগিন্দ্র সান্যালেরই বংশী আছে, আর আমার বংশ নেই? তোমার জন্যে দু'চারটে স্পাই আমাকেও রাখতে হয়।'

বিনয় ব্রজলালের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো। পরে আস্তে-আস্তে ফ্যাকাসে মুখে বাড়ির দিকে ফিরে চললো।

দশ

মাধব—মাধব—সবখানেই মাধব। সব কিছুই মাধবের। চাকর-বাকর, পাইক-পেয়াদা—সব মাধবের জন্যে খাটছে। বাজার আসছে মাধবের জন্যে। ঠাকুরবাড়ি পূজো হচ্ছে মাধবের কল্যাণে। সংসারে যে এত আনন্দ-কোলাহল, সব মাধবের উদ্দেশ্যে। তুমি কে? তুমি কেউ নও। এটায় হাত দিও না, এটা মাধবের। এটায় দাঁত বসাতে চেয়ো না, মাধবের ভাগে কম পড়ে যাবে। মাধব আগে খেয়ে নিক, তারপর তার পাতে যদি উচ্ছিষ্ট কিছু থাকে, তবে তোমার। সমস্ত সংসারে এটাই এখন উচ্চ ভাষায় বিঘোষিত।

এমন অবান্তর, অবাঞ্ছিতের জন্যেও আইন কিছু অংশ রেখেছে এটাই সুনয়নীর মর্মশূল। অংশ যদিও কিছু পাও, আশ্রয় পাবে না, পাবে না আর মা, পাবে না আর ভাই, কোনো দিন না।

বিনয় যখন ছুটির শেষে কোলকাতায় চলে আসে তখন বাড়ি থেকে বেরুবার সময় মা সামনে আসেন নি পদধূলি দিতে, মাধবকে দেখতে পায়নি সে যাবার পথের দিকে জানলা ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে। সম্পূর্ণ পরের ছেলে হয়ে কেন সে মাধবের বাপের সম্পত্তিতে ভাগ বসাবে এটাই সুনয়নীর অসহ্য। তাই এতদিন বাইরেই ছিল ব্রজলাল, এখন অন্তঃপুরে এল সুনয়নী।

বিনয়ের সমস্ত চিন্তার মোড় একেবারে ঘুরে গেল, যখন

কোলকাতায় তার নামে এবার মনি-অর্ডার এলো কুড়ি টাকা কম। টানাটানির বছর বলে কুড়ি টাকা কম পাঠিয়েছে শুনলে বিনয় ব্যস্ত হতো না ; কেননা যে টাকা আসে তার থেকে কুড়ি টাকা কম পড়লে তার দুদিনের রেস্টোর‍্যান্ট বা সিনেমাই যা বাদ পড়তো। কিন্তু সুনয়নী যুক্তি যা দেখিয়েছেন তা অসাধারণ। লিখেছেন, মাধবকে বর্ণপরিচয় পড়াবার জন্যে মাস্টার চাই। জমিদার-বাড়ির মর্যাদা রেখে মাইনে দিতে গেলে কুড়ি টাকার কম দেয়া যায় না। অতএব এই কুড়ি টাকা বিনয়কেই জরিমানা দিতে হবে।

এবার বিনয় নিজের অন্তরকে প্রথম জিগগেস করলো ঃ কে মাধব ? এবং তখন থেকে এই একই প্রশ্ন তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে।

কে অবান্তর—সে না মাধব ? কে আকস্মিক ? কে অকারণ ? সে মাধবের জীবনে রাহু, না তার জীবনে রাহু ঐ মাধব ? কে কার সর্বনাশ করেছে ? সে মাধবের, না মাধব তার ?

যদি মাধব না আসতো এ পৃথিবীতে ! তা হলে সে এক চুলও নড়ে বসতো না। সুনয়নীর চোখেও জ্বলে উঠতো না এই হিংসার আগুন। সব তার ঠিক-ঠিক বজায় থাকতো—তার বাবা, তার মা, তার নায়েব-গোমস্তা, তার ভূসম্পত্তি। থাকতো সে একেশ্বর, একচ্ছত্র। থাকতো তার অপ্রতিহত গতি, অনমনীয় প্রভুত্ব। সমস্ত সংসারে চলতো তার স্বেচ্ছাতন্ত্র।

কিন্তু কোত্থেকে পুঁচকে একটা শিশু এসে সমস্ত তছনছ ওলোট-পালোট করে দিল। বসেছিল সে সিংহাসনে, এখন আর কার প্রবেশে জায়গা ছেড়ে সে উঠে দাঁড়ালো? ক্রমশ সে বিতাড়িত হয়ে চলেছে বাইরে, পথে, গাছের তলায়। কী দুর্ধর্ষ শক্তি ঐ শিশুটার! তার এতদিনের মা আর তার মা রইলো না, বাবা মুখ ফিরিয়ে রইলেন, আমলা-মুহুরিরা নীরবে অবজ্ঞা করতে লাগলো। কার—কার জন্যে তার এই ক্ষতি—এই অধঃপতন?

বিনয় ঘরের মধ্যে পাইচারি করতে লাগলো।

কিন্তু মাধব—মাধব যদি আর না থাকে!

সহসা বিনয়ের বুকের মধ্যখানটা যেন কে মুঠি চেপে ধরলো, মেরুদণ্ড বেয়ে উঠে গেল সূঁচের মত তীক্ষ্ণ একটা ঠাণ্ডা স্রোত। তার টেবিলের উপর সাজানো মড়ার মাথার খুলিটা দুই শূন্য চক্ষুকোটর থেকে তার দিকে চেয়ে রইলো।

দিগিন্দ্র সান্যালের একটা কথা বারে-বারেই তার মনের মধ্যে গুঞ্জন করে ফিরতে লাগলো: 'ঐ তো এক রতি একটা খুদে শিশু, তার জীবনের মূল্য কী? ভরসা বা কোথায়? কে বলতে পারে একদিন তোমার পাঁচ আনা চার পাই অংশ ফের ষোল আনা হয়ে উঠবে না?'

কেউ বলতে পারে না। একদিক থেকে দেখলে সংসারে বিচিত্র যেমন কিছু নেই; আবার আরেক দিক থেকে দেখলে সংসারে সব কিছুই বিচিত্র।

আচ্ছা, ধরো, এমনিতে স্বাভাবিক নিয়মেই যদি মাধব মরে

যায়! কী হয় তবে? বিনয়ের হঠাৎ যেন হাঁপ ধরে গেল, ক্ষণকালের জন্য। ক্ষণকাল—সমস্ত কিছুই ক্ষণকালীন! মাধবের জন্যে—তার শৈশব, তার সারল্য, তার অসহায়তার কথা ভেবে তার দুঃখ হবে বটে, কিন্তু একদিক থেকে সুখও হবে প্রচুর। তার পাঁচ আনা চার পাই ফের ষোল আনা হয়ে উঠবে বলে নয়, ব্রজ-নায়েবকে কান ধরে ওঠ-বোস করাবে বলে নয়, বংশধরকে বাঁশডলা দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবে বলে নয়, সুনয়নীর সমস্ত গর্ব চূর্ণ হয়ে যাবে বলে, তাঁর মেঘলোকের রঙীন স্বপ্ন-প্রাসাদ ঝড়ের ফুঁয়ে উড়ে যাবে বলে। সে একটা কী উল্লাস! হৃতসর্ব্বস্ব সুনয়নী শোকাকুল চোখে অতি দীন ভাবে তার কাছে এসে হাত পেতে দাঁড়াবেন। আর প্রচ্ছন্ন গর্ব ও উদারতার ভাব নিয়ে বিনয় বলবে, 'তোমাকে কি মা আমি ফেলতে পারি?'

টেবিলের উপরকার মড়ার হাড়গুলি নিয়ে বিনয় নাড়াচাড়া করতে লাগলো। তার মনে হলো, সব মানুষই তো আর স্বাভাবিক নিয়মে মরে না। মরে অপঘাতে, মোটর চাপা পড়ে, ট্রেন্-কলিশনে, স্টিমার-ডুবি হয়ে। আরো কত ভয়ঙ্কর আকৃতি নিয়ে মৃত্যু এসে দেখা দেয়। সেই কবে কে কার শরীরে শুধু একটা ইনজেকশানের সূঁচের ডগা ফুটিয়ে মেরে ফেলেছিলো। মাধব যে স্বাভাবিক নিয়মে রোগে ভুগেই মরবে তার ঠিক কি!

বিনয় আজকাল আর কলেজে যায় না, দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে থাকে। যদিও বা বাইরে কখনো

সে যায়, বাছাই-করা দু'একজন বয়স্ক ডাক্তারের সঙ্গে সে আড্ডা দেয়, পরামর্শ করে। সে জমিদারের ছেলে—এই আকর্ষণে বাছাই-করা বয়স্ক ডাক্তাররাও তার সঙ্গে মিশতে কুণ্ঠিত হয় না।

কিছু দিন যেতে-না-যেতেই বিনয়ের নামে হঠাৎ এক টেলিগ্রাম এসে হাজির: 'মাধব মারাত্মক অসুস্থ, শীগগির চলে এসো।'

খবরটা পেয়ে কোথায় বিনয়ের শোক উথলে উঠবে, তার বদলে কেমন-যেন একটা ভয় করতে লাগলো!

বিনয়কে খবর পাঠাতে হবে তাতে সুনয়নীর প্রথমে সমর্থন ছিল না, কিন্তু সদর-থেকে-আনা সরকারী বড়-ডাক্তার যখন বললেন, 'ছেলেটা এমন দাদা-দাদা করছে, দিন না ওর দাদাকে টেলি করে। কী এমন পড়ার ক্ষতি হবে! আগে ভাই না আগে পড়া!' তখনই সুনয়নী টেলি করতে বললেন ব্রজ-নায়েবকে। বড়-ডাক্তার আরো বললেন, 'রোগ যে কী, এখনো ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। কে জানে হয়তো দাদাকে পেয়ে ভালোর দিকে মোড় ফিরবে।'

প্রথম ট্রেনেই বিনয় মোহনপুরে ফিরে এল, এবং বাড়িতে পৌঁছেই প্রথম মাধবের বিছানায়। বললে, 'মাধব, আমি এসেছি, আমি দাদা।'

যে-ছেলে এতদিন ধরে জ্বরে বেহুঁস, চোখ মেলেনি শত ডাকেও, সে হঠাৎ এক ঝাঁকুনিতে বিছানার উপর উঠে বসলো, লজ্জিত আনন্দে যেন-বা একটু হাসলো আর দুই হাত বাড়িয়ে

ঝাঁপিয়ে পড়লো সে দাদার বুকে। বিনয় তাকে সস্নেহে অথচ নিবিড় করে জড়িয়ে ধরলো।

সুনয়নী আজ তাঁর বাহুতে এমন শক্তি পেলেন না যে বিনয়ের বুকের থেকে মাধবকে কেড়ে নেন। শুধু বললেন, 'খোকাকে আস্তে-আস্তে বিছানায় শুইয়ে দাও।'

মাধবকে বিনয় শুইয়ে দিল বটে কিন্তু নিজেকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে নিতে পারলো না। দেখলো, তার জামার গলাটা মাধব এক হাতে আঁকড়ে ধরে আছে। বলছে, 'বলো, আমাকে না বলে চলে যাবে না? বলো, যখন যাবে আমাকে আদল কলে যাবে?'

বিনয় প্রতিশ্রুতি দিল, তবে মাধব জামা ছাড়লো।

বড়-ডাক্তার এসে ভারি খুসি হলেন। বললেন, 'বাঃ, দাদাকে পেয়েই অসুখ সেরে গেছে দেখছি।'

মাধব হাসলো—লজ্জায় ও আনন্দে মেশানো সেই হাসি।

মাধবের অবস্থার অনেক উন্নতি হলেও রোগ কিছুতেই নির্মূল হচ্ছে না, গা থেকে জ্বর যাচ্ছে না মুছে। এখন সে বিছানায় উঠে বসে, কখনো-কখনো স্বাভাবিক দৌরাত্ম্যবশে খাট থেকে নেমে পড়ে, একটু-একটু হেঁটে বেড়ায়—কিন্তু আসল রোগের এখনো বিনাশ হচ্ছে না বলে শেষ পর্যন্ত বিছানায়ই ফের ফিরে আসতে হয়। কোথায় যে রোগ বাসা বেঁধে আছে, তার সন্ধান নেই।

রোগ যখন সারবার হয় সারবে, কিন্তু মাধব যে দাদাকে

সমস্তক্ষণের জন্যে সাথী পেয়েছে, তাতেই তার আনন্দ আর ধরে না! কিন্তু তার ততখানি বাড়াবাড়ি সুনয়নী বরদাস্ত করতে পারেন না। দাদা ছাড়া কারু হাতে সে পথ্য খাবে না, দাদা তাকে ধরে না থাকলে ডাক্তারের হাতে সে ইনজেকশান নেবে না, দাদা শিয়রে বসে চুলে হাত বুলোতে-বুলোতে গল্প না বললে ঘুমুবে না সে কিছুতেই। বিনয়ের ঘর ছিল কত দূরে, তাকে টেনে নিয়ে এসেছে সে পাশের ঘরে—আর দু' ঘরের মাঝখানে দরজা রেখেছে খোলা। পাশের ঘরে দাদা শুয়ে আছে, এই মাধবের অনেকখানি সাহস।

'কিন্তু দাদাকে পড়তে যেতে হবে না কোলকাতায়?' সুনয়নী বলে ওঠেন: 'ও কি এইখানেই থাকবে নাকি? ওর কলেজ নেই?'

বিনয়ের এখানে কলেজ কামাই করে বসে থাকাতে যে ক্ষতি হচ্ছে তাতে সুনয়নীর বিশেষ মাথা-ব্যথা ছিল না; কিন্তু যেভাবে দিনে-দিনেই দাদার প্রতি মাধবের আসক্তি ও আনুগত্য গভীর হয়ে উঠছে, তাতেই তিনি ভয় পাচ্ছেন।

সমস্যাটা মাধব এক কথায় জল করে দিল। বললে, 'চলো না সবাই আমরা কোলকাতায় যাই।'

বিজয়নারায়ণ কথাটা পাড়লেন বড়-ডাক্তারের কাছে। বড়-ডাক্তার সায় দিলেন না। বললেন, 'কী দরকার! জ্বর তো এখন আরো কমে উঠছে, থাকছেও কম সময়। কোলকাতায় যাওয়ার অর্থ—চিকিৎসা-মহাসমুদ্রে নেমে খাবি খাওয়া।'

তাই বিনয় শীগগিরই ফিরে যাবে, দু'চার দিনের মধ্যে। আরেকটু—আরেকটু—মাধব ভালো হলেই। কতটুকু ভালো হলে, সে ঠিক করতে পারে না। কেবল দিন খোঁজে।

এক দিন মাধব বললে, 'তুমি যাবে কোলকাতা, দাদা? যাও, কিন্তু যাবাল ছময় আমাকে খুব আদল কলে যাবে, কেমন? আল, আমাকে চিঠি লিখবে।'

বিনয় বললে, 'না, এখন না। তুমি আরো একটু ভালো হও।'

সে যে কতটুকু ভালো সে বুঝে উঠতে পারে না।

বড়-ডাক্তার এখন আর নিয়মিত আসেন না, তাঁর সহকারী আসেন। সদর থেকে মোহনপুর তিনখানা ট্রেন যাতায়াত করে, রাস্তাও দূরের নয়, আর দক্ষিণা সম্বন্ধে দাক্ষিণ্য যেখানে অবারিত, সেখানে ডাক্তারের কোনো পরিশ্রমই গায়ে মাখবার নয়।

সপ্তাহে এখন দু'দিন করে ইনজেকশান চলছে। এরি একদিন সহকারী-ডাক্তার বললেন, 'পরের দিন আমি আসতে পারবো না, আমার ভাগ্নীর বিয়ে, না গেলেই নয়।' পরে হঠাৎ বিনয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি পারবেন না একটা হাফ সি-সি দিয়ে দিতে?'

'স্বচ্ছন্দে।' বিনয় বললে।

'কেন, আপনি আর-কোনো ডাক্তার না-হয় সদর থেকে পাঠিয়ে দেবেন।' সুনয়নী প্রতিবাদ করে উঠলো।

কিন্তু মাধবের প্রতিবাদটা বেশি শক্তিশালী। সে বলে উঠলো, 'দাদা ছালা আল কালো হাতে আমি ইনজেশান নেবো না।'

'কেন, সেদিন যখন মাধব ডাক্তার-সাহেবকে কিছুতেই ইনজেকশান দিতে দেবে না তখন তাঁর কথা-মতো আমিই তো দিয়ে দিলাম।' বিনয় বললে।

'হ্যাঁ, এ আবার কী একটা শক্ত কাজ!' সহকারী ডাক্তার সায় দিলেন ঃ 'ক'দিন পরে তো দোহাত্তাই চালাতে হবে।'

'দাদা দিলে আমাল এৎতুও ব্যথা লাগে না।' মাধব সব সময়েই তার দাদার পক্ষে।

'আর আমি দিলে বুঝি লাগে?' সহকারী ডাক্তার হাসলেন। সুনয়নীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি যাই কি না এখনো ঠিক নেই। আচ্ছা, আমার জন্যে সেকেণ্ড ট্রেনটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন।'

সুনয়নী বললেন, 'না, শেষ ট্রেন পর্যন্ত অপেক্ষা করবো।'

'শেষ ট্রেন তো রাত নটায়।'

'কেন, তখন ইনজেকশান চলে না?'

'চলে বৈ কি।'

'তবে, দশটা পর্যন্ত না এলে বুঝবো যে আপনি এলেন না। তখন—'

'আচ্ছা, আচ্ছা, তবে রাত দশটার সময়ই হাফ সি-সি একটা ইনজেকশান করে দিও।' বিনয়ের পিঠ ঠুকে দিয়ে সহকারী

ডাক্তার হাসিমুখে বেরিয়ে গেলেন। বললেন, 'যদি না আসি, সিরিঞ্জ ইত্যাদি সব রেখে গেলাম।'

পরবর্তী দিনটা বেস্পতিবার। সকালে উঠেই বিনয়ের মনে হলো, ডাক্তার যেন আজ না আসে!

সকালটা কাটলো রুদ্ধ নিশ্বাসে। সকালের ট্রেনে আসেনি। দুপুরটা কাটলো ঘুমিয়ে। দুপুরের ট্রেনেও নয়। এখন রাত ন'টার ট্রেন।

সন্ধ্যার সময় মাধবের ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর রাখা ডাক্তারের সিরিঞ্জটা খুলে বিনয় একবার পরীক্ষা করলো; দেখলো, সূঁচটার ধার কেমন। ভাবলো, না, নিজের সিরিঞ্জ ব্যবহার করাই নিরাপদ।

একটু সকাল-সকালই সে রাতের খাওয়া সেরে নিল।

সন্ধ্যার কতক্ষণ পরে সে আরেকবার মাধবের ঘরে ঢুকেছিল। মাধব তখন নিশ্চিন্ত শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে। আশে-পাশে গোটা দুই-তিন চাকর, বিশেষ করে সুনয়নী যখন নেই ঘরে। তার মধ্যে কোন্‌টা যে ব্রজ-নায়েবের গুপ্তচর, বিনয় ঠাহর করতে পারে না। কিন্তু গুপ্তচরকে তার আর ভয় নেই। সে লুকিয়ে কিছু করছে না। যা সে করছে, প্রকাশ্যে করছে। সে এখন ডাক্তার। অন্তত ডাক্তার-কর্তৃক আদিষ্ট।

ন'টা বাজলো—সাড়ে ন'টা। সহকারী ডাক্তারের দেখা নেই। সুনয়নী হয়তো ভেবেছেন, ডাক্তার যখন শেষ পর্যন্ত এলো না, তখন ইনজেকশানটা আজ বাদই পড়লো না হয়, এবং

এই ভেবে হয়তো তন্দ্রাবিষ্ট হয়ে মাধবের শিয়রে শুয়ে পড়েছেন। কিন্তু বিনয় নিজে ডাক্তারি লাইনে থেকে এমন দায়িত্বজ্ঞানহীনতার তো প্রশ্রয় দিতে পারে না। তাই তাকে এখুনি প্রস্তুত হতে হয়।

বিনয় বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। প্রথমেই মাথায় খানিকটা সে জল ঢাললে। না, যতই জল ঢালুক, মাথা তার ঘুরবেই।

ঘুরুক, এখনো টলে পড়েনি একেবারে। আর দেরি করা যাবে না।

বিনয় তার জামার পকেটে হাত ঢোকালো। এ-পকেট থেকে ও-পকেট, ও-পকেট থেকে আবার এ-পকেট—মুখ তার ছাইয়ের মত পাংশু হয়ে গেল—কিন্তু, কিন্তু তার সেই প্যাকেটটা গেল কোথায়? কী ভীষণ! তার পকেট থেকে ব্রজ-নায়েব সেই প্যাকেটটা আলগোছে তুলে নিয়ে গেল নাকি? সেই প্যাকেটের মধ্যে যে তার সিরিঞ্জ আর সূঁচ ছিল, আর-একটা ছোট্ট টিউবের মধ্যে যে ছিল বিষ! অনেক সূক্ষ্মে, অনেক সুদূরে যার কাজ এবং পরিণাম যার অলঙ্ঘনীয়।

ভূতগ্রস্তের মতো বিনয় বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। যদিও সে জানে এখানে আসা অবধি প্যাকেটটা তার পকেটে-পকেটেই ঘুরছে, শোবার সময় বালিশের খোলের মধ্যে, তবুও সে তার বাক্স-বিছানা ওলোট-পালোট করে দেখতে লাগলো। কোথাও কিছু নেই। ঢং ঢং করে দশটা বেজে গেল। সর্বাঙ্গ বেয়ে ঘাম

ঝরতে লাগলো বিনয়ের। এতক্ষণে ব্রজ-নায়েব নিশ্চয়ই প্যাকেটটা নিয়ে সদরে রওনা হয়ে গিয়েছে। বড়-ডাক্তার, পরে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট! কী ভয়ঙ্কর হাত-সাফাই। এতদিন পরে যেই প্রথম সুবর্ণ-সুযোগ উপস্থিত হলো, ঠিক সেই দিনই কিনা ব্রজ-নায়েব সেটা আলগোছে চুরি করলে! অথচ এত সতর্ক এত সাবধান সে!

বহুক্ষণ পরে বিভ্রান্তের মতো বিনয় আবার তার জামার পকেট হাটকাতে লাগলো, জুতোর থেকে পা তুলে নিয়ে দেখলো জুতোর মধ্যে আছে কিনা, শূন্য একটা কুঁজো নেড়ে দেখলো তার মধ্যে যদি থেকে থাকে!

বিনয় হঠাৎ দুই হাতে চুলগুলি আঁকড়ে ধরে দেয়ালের উপর সজোরে মাথা ঠুকতে লাগলো। নিজের গলা সে নিজেই দু' হাতে প্রাণপণ জোরে চেপে ধরলো। দাঁত বসিয়ে প্রচণ্ড আক্রোশে কামড়াতে লাগলো সে নিজের হাত।

মুহূর্তে জানাজানি হয়ে যাবে, সে ভাইকে সেবা করবার অছিলায় পকেটে করে বিষ নিয়ে এসেছিল ভাইকে খুন করবার জন্যে। হায়, কোথাও খুঁজে পায় না সে প্যাকেটটা? যদি পেত, নিজের হাতে এক্ষুনি তবে সে-বিষ সে নিজের রক্তে দিত মিশিয়ে।

হঠাৎ ঘরে যেন কিসের একটা কালো ছায়া পড়লো! আতঙ্কে বিনয় একেবারে হিম হয়ে গেল। কিন্তু ছায়াটা দেয়ালে সরে আসতেই তার কায়ার পরিমাপ ও সামঞ্জস্য বিচার

করে বিনয় শিউরে উঠলো। দরজার দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো, মাধব। দুর্বল পায়ে কাঁপতে-কাঁপতে চলে এসেছে।

'ঠং ঠং কলে দশটা বেজে গেছে দাদা, আমাকে ইনজেশান দেবে না? মা ঘুমিয়ে পলেছে, তুমিও আসছ না, তাই আমিই চলে এসেছি।'

বিনয় নিস্প্রাণ পাষাণমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো। এ কি মাধব না মাধবের প্রেতাত্মা?

'আল দাদা, এতা তুমি আমাল বিছানায় ফেলে এসেছ।' মাধব তার শীর্ণ ডান হাতখানা একটু বাড়িয়ে ধরলো।

মাধবের হাতে বিনয়ের সেই প্যাকেট।

'এটা তুই কোথায় পেলি?' বিনয় ছুটে গিয়ে মাধবকে বুকে তুলে নিল।

'তখন তোমাল পকেটের লুমালতা আমাকে দিয়ে দিলে না, তখন ছেতাল সঙ্গে এতাও চলে এসেছে।'

ক্ষিপ্র হাতে বিনয় তার পকেটটা অনুভব করলো, সত্যি সেখানে রুমাল নেই।

'ওতাল মধ্যে কী আছে দাদা? চকোলেট?'

'না, ওষুধ—ওষুধ আছে।' প্যাকেটটা বিনয় বুক-পকেটে রেখে দিল।

'আমাল জন্যে? ইনজেশান দিয়ে দেবে?' ঈষৎ অভিমানী গলায় মাধব বললে, 'তবে দিয়ে দিচ্ছ না কেন? তুমি

ইনজেশান দিয়ে দিলেই আমি ভালো হয়ে যাব, দাদা। তোমার ইনজেশানে এৎতুও ব্যথা লাগে না।'

বিনয় মাধবকে ব্যাকুল আগ্রহে বুকের উপর চেপে ধরে তার মাথায়, কপালে ও গালে অজস্র চুমু খেতে লাগলো।

মাধব হাসলো মৃদু-মৃদু। বললে, 'আমাকে তুমি এখন এত আদর কচ্ছ কেন, দাদা ?'

'আমি যে এখন চলে যাচ্ছি, মাধব। তুই বলিসনি যাবার আগে তোকে যেন আদর করে যাই।' বিনয় নিবিড় স্নেহে মাধবকে বেষ্টন করে রইলো। তার শুষ্ক চোখ জলে আচ্ছন্ন হয়ে এল।

'আমায় ইনজেশান দেবে না ?'

'না। দরকার হবে না। আমি বলছি এমনিতেই তুই ভালো হয়ে উঠবি।' মাধবের জ্বরজীর্ণ শীর্ণ গায়ে বিনয় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

মাধবের ঘরে এসে মাধবকে শুইয়ে দিল বিছানায়। সুনয়নী ধড়মড় করে উঠে বসলেন। ভয়ার্ত মুখে বললেন, 'এ কী, হয়ে গেল নাকি ইনজেশান ? আমাকে ডাকোনি কেন ? আমাকে না দেখিয়ে কেন ইনজেশান দিলে ? ও রমু, ও বংশ, ও মদন, কোথায় তোরা ? শীগগির নায়েববাবুকে ডেকে নিয়ে আয়।'

মাধব হেসে উঠলো। বললে, 'না মা, ইনজেশান দেয়নি দাদা। দাদা বললে, এমনিতেই আমি ভালো হয়ে উথবো।'

'দেয়নি ? কই দেখি ?' সুনয়নী সূক্ষ্ম চোখে মাধবের

বাহু দুটো পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন; উঠে গিয়ে দেখলেন টেবিলের উপর ডাক্তারের সব সরঞ্জাম তেমনিই আছে, কে তাদের ধরেনি, নাড়াচাড়া করেনি।

সুনয়নীর দৃষ্টির সঙ্গে বিনয়ের দৃষ্টির একটা সজ্ঘর্ষ হলো সুনয়নীর দৃষ্টিতে আতঙ্ক আর ঘৃণা, বিনয়ের দৃষ্টিতে হিংস্র কুটিলতা।

'ইনজেশান আর দিলুম না, মা। কেননা, তুমি যদিও আমার মা নও, মাধব আমার ভাই। মাধবকে আমি সব, আমার প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারি। মাধবকে আমি সব—সব দিয়ে গেলুম।' বলে বিনয় খোলা দরজা দিয়ে ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল।

বাইরে বনবহুল গ্রামের নিবিড় অন্ধকার, দিকহীন বিনয় আজ দিগন্তের সন্ধানী।

—শেষ—